অন্ধকারের আগন্তুক

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

এক

বেঙ্গল-আসাম রেলপথের একটা ছোট স্টেশনের ওপর কৃষ্ণপক্ষের রাত ঘুটঘুট করছিল। স্টেশনটা কিন্তু বাংলা দেশে নয়, আসামেও নয়। তোমরা হয়তো জানো, বাংলাদেশের ঠিক প্রতিবেশী, উত্তর বিহারে একটা জেলা আছে—নাম পূর্ণিয়া। অনেকদিন আগে পূর্ণিয়াকে বাংলার মধ্যে ধরা হত—পরে এটাকে বিহারের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। আজও এ-জেলার একটা অংশের মানুষ পুরোপুরি বাঙালী—হাটে-বাজারে বন্দরে-গঞ্জে অসংখ্য বাঙালীর বসতি।

এই জেলাটার ভিতর দিয়ে বেঙ্গল-আসাম রেলপথের অনেকগুলো শাখা প্রকাণ্ড একটা বটগাছের ডালপালার মতো ছড়িয়ে রয়েছে। তারই কোনও একটা শাখাপথের ওপরে ছোট্ট একটি স্টেশন—ধরা যাক তার নাম মানিকপুর।

রাত বারোটা পেরিয়ে গেছে। স্টেশনমাস্টার গণেশবাবু টেবিলে একটা পা তুলে দিয়ে হাঁ করে নাক ডাকাচ্ছেন আর মাঝে মাঝে চমকে জেগে উঠেই গালে ও কপালে প্রাণপণে থাবড়া মেরে মশা মারবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু মাঠের বেপরোয়া মশা চড়চাপড়ে ভয় তো পাচ্ছেই না, চারিদিক থেকে আরও মরিয়া হয়ে ছেকে ধরেছে।

কিন্তু ধৈর্যেরও সীমা আছে মানুষের।

শেষ পর্যন্ত চেয়ার থেকে তড়াক করে নেমে পড়লেন গণেশবাবু।

খানিকক্ষণ অভদ্র ভাষায় মশাদের বাপ-বাপান্ত করলেন, তারপর কোণের কুঁজো থেকে ঢকটক করে গেলাস তিনেক জল গড়িয়ে খেয়ে একটা বিড়ি ধরালেন।

ঢং। ঘড়িতে সাড়ে বারোটা।

জল খেয়ে গরম লাগছিল। কোটটা খুলে গণেশবাবু বাইরে বেরিয়ে এলেন।

অদ্ভুত গুমোট রাত। আকাশের তারাগুলোকে নিবিয়ে দিয়ে মেঘ এসে জমেছে—যেন অন্ধকারের একটা বিরাট ডাইনী-মূর্তি চারদিকে তার গুচ্ছ-গুচ্ছ কালো-কালো চুল মেলে দিয়েছে। স্টেশনের পেছনে ফাঁকা মাঠ—তার ভেতর দিয়ে একটা ধুলোভরা মেঠো রাস্তা তারার আলোয় খানকিটা আবছা আভাস দিয়ে মিলিয়ে গেছে। একটু দূরে সেই পথের ওপর ঝাঁকড়া একটা বটগাছ অন্ধকারকে আরও কালো করে ওঁত পেতে বসে আছে—যেন আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ির মতো। একফোঁটা বাতাস নেই কোথাও—গাছের একটা পাতা অবধি নড়ছে না।

সামনে মিটার গেজের ছোট ছোট তিনটি লাইন। ওপারে একটা অন্ধকার ফাঁকা মালগুদাম—তার পেছনে মাটিটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে বিল আর শ্যাওড়াবনের মধ্যে। ওখানে শেয়াল আছে, বুনো শুয়োর আছে, কখনও-কখনও নাকি চিতাবাঘও এসে আস্তানা গাড়ে শীতের সময়। আশেপাশে দু-তিন মাইলের মধ্যে জনমানুষের বসতি নেই—শুধু রেল-কোম্পানির বাবু আর কুলিদের ছোট ছোট তিন-চারটে কোয়াটার ছাড়া।

সৃষ্টিছাড়া জায়গা—তার চেয়ে সৃষ্টিছাড়া একটা ইস্টেশন! অত্যন্ত বিরক্ত মনে গণেশবাবু প্ল্যাটফর্মের উপর পায়চারি করতে লাগলেন। তাঁর ডিউটি রাত তিনটে পর্যন্ত—অথচ এখন মোটে সাড়ে-বারোটা। অর্থাৎ আরও অন্তত আড়াই ঘণ্টা এখানে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। আর যা মশা—সন্ধে থেকেই কানের কাছে যেন ক্ল্যারিয়োনেট বাজাচ্ছে।

ভুড়িটার ওপর হাত বুলোতে বুলোতে গণেশবাবু ভাবতে লাগলেন, এখন ম্যালেরিয়া না ধরলেই বাঁচা যায়। বরাবর কলকাতায় মানুষ—কলকাতার ছেলে, সাপ, ব্যাঙ, জোঁক, ম্যালেরিয়ার নামে তাঁর গায়ের রক্ত শুকিয়ে আসবার উপক্রম করে। অথচ সেই গণেশবাবুকেই কিনা শিয়ালদা থেকে একেবারে এই অজগর

বিজুবনে বদলি করে দিলে। রাগে-দুঃখে গণেশবাবুর মাথার মধ্যে রক্ত চনচন করতে লাগল।

সব দোষ ওই ব্যাটা ফিরিঙ্গির—ওই গোমেজটার। গোমেজ তো নয়—এক সঙ্গে গো এবং মেষ। তারই লোভের প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে গণেশবাবুকে। বন্ধু তো নয়, শনি।

একঝুড়ি ভাল ল্যাংড়া আম যাচ্ছিল কলকাতা থেকে জলপাইগুড়িতে। গোমেজের বুদ্ধিতে পড়ে তারই গোটাকয়েক দুজনে মিলে ভাগাভাগি করে নির্বিবাদে সেবা করেছিলেন, তারপর ইট-পাটকেল দিয়ে ঝুড়ির মুখ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আম যাচ্ছিল জলপাইগুড়ি কলেজের ফিজিক্সের প্রফেসার ভাদুড়ীমশায়ের নামে। তিনি দুঁদে লোক- শ্রাদ্ধ অনেক দূর গড়াল, গেল আদালত পর্যন্ত ।

গোমেজ নিরাপদে স্রেফ কেটে গেল, কিন্তু জালে পড়লেন গোবেচারা পেটুক মানুষ গণেশবাবু। ফলে, এক ধাক্কায় গণেশবাবু কলকাতা থেকে এই মাঠ আর জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়লেন। পাপের ভোগ আর কাকে বলে !

আগুন হয়ে গণেশবাবু ভাবতে লাগলেন, গোমেজকে এখন হাতের কাছে পেলে এক চাটিতে তিনি তার গলাসুদ্ধ উড়িয়ে দিতেন । উঃ, এখানে মানুষ থাকতে পারে। কোনদিন যে বাঘে মুখে করে নেয় ঠিক নেই। আর তাও যদি না হয়—যা মশার অত্যাচার—তিনদিনেই রক্ত শুষে ছিবড়ে করে দেবে তারা। গণেশবাবুর কান্না পেতে লাগল।

রাত থমথম করছে ! কোনওখানে একটু হাওয়া নেই—শুধু যেন চারিদিক থেকে রোদ-পোড়া মাটির গন্ধ উঠছে। আকাশে জমেছে কালো মেঘের রাশ। ঝড়-বৃষ্টির লক্ষণ দেখা দিচ্ছে ঈশানের কোণায় কোণায়।

হঠাৎ গণেশবাবুর ভয়ানক ভয় করতে লাগল। কেমন আশ্চর্য লাগছে। লাগছে পৃথিবীকে। মনে হল, এমন রাত্রে সম্ভব-অসম্ভব কত কী যে ঘটতে পারে। হালুম করে অন্ধকার মালগুদামটার ওপাশ থেকে একটা বাঘ এসে লাফিয়ে পড়তে পারে, রেললাইনের ওপর থেকে একটা শঙ্খচূড় সাপ ফণা উঁচু করে তেড়ে আসতে পারে, দূরের ওই বটগাছটা থেকে গোটা কয়েক কালো-কালো, মোটা-রোগা, লম্বা-বেঁটে, মামদো কিংবা হেঁড়ে ভূত এসে নাচানাচি শুরু করতে পারে।

কাঁপা গলায় গণেশবাবু ডাকলেন, গিরিধারী !

ছোট স্টেশনের একমাত্র পেয়েন্টসম্যান গিরিধারী স্টেশনের বারান্দায় একটা লোহার খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে ঝিমুচ্ছিল। হাতের পাশেই তার লাল-নীল লণ্ঠনটা রাখা, তা থেকে দুদিকে দু-রঙা আলোর রশ্মি ছড়িয়ে পড়েছে। তার মাথাটা বুকের ওপর ঝুঁকে নেমেছে, গিরিধারী গভীর ঘুমে মগ্ন।

—এই ব্যাটা গিরিধারী—

বিরক্ত গণেশবাবু গিরিধারীকে সজোরে একটা ঠোক্কর লাগালেন। আঁই-আঁই করে গিরিধারী উঠে বসল। বললে, কী হুজুর, কোনও মালগাড়ির কি ঘণ্টি হল?

—না না, কোথায় মালগাড়ি। একা-একা বড় ভয় করছে রে গিরিধারী, আয় একটু গল্প করা যাক।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও গিরিধারী উঠে বসল। ঢং—আর একটা শব্দ হল ঘড়িতে। রাত একটা। প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলো সব বেরিয়ে গেছে, শেষরাতের আগে আর ট্রেন নেই। কোয়াটারে গিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোনো চলে এখন। কিন্তু যুদ্ধের সময় । যখন-তখন একটা মিলিটারি স্পেশাল কিংবা গুডস-ট্রেন এসে পড়তে পারে।

প্যাসেঞ্জারদের জন্যে রাখা লোহার বেঞ্চে গা এলিয়ে দিয়ে একটা হাই তুললেন গণেশবাবু।

— আচ্ছা, এই মাঠ আর জঙ্গলের মধ্যে কোম্পাণি একটা স্টেশন কেন বসালে বলতে পারিস?

লাল-নীল লণ্ঠন থেকে একটা রক্ত রঙিন আভা গিরিধারীর মুখের ওপর এসে পড়েছিল, আর সেই আলোয় তার চামড়া-কুঁচকে-যাওয়া বুড়ো মুখখানাকে কেমন নুতন রকমের লাগছিল দেখতে। গণেশবাবুর প্রশ্নে তার চোখ দুটো হঠাৎ যেন চকচক করে উঠল।

—সে অনেক কথা বাবু। অনেক ব্যাপার।

গণেশবাবু কৌতুহলী হয়ে উঠলেন।

—বল, শোনা যাক। বিতিকিচ্ছি রাতটা খানিক গল্প শুনেই কটুক।

আকাশটা মেঘে আড়ষ্ট হয়ে আছে। রেল-লাইনের সরু সরু রেখাগুলো প্ল্যাটফর্মের অল্প-অল্প আলোয় ঝিকিয়ে উঠেছে, যেন অন্ধকারের আড়াল থেকে কোনও অশরীরীর একটা নিষ্ঠুর হাসি ঠিকরে পড়েছে তাই থেকে। দূরের বিল আর শ্যাওড়া বনের ভিতর থেকে কতকগুলো শেয়াল একসঙ্গে 'ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া' বলে ডেকে উঠল।

সেদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে গিরিধারী বললে, অনেককাল—সে বহুদিন হয়ে গেল বাবু—এখান থেকে তিনকোশ দূরে নীলকর সায়েবদের একটা ঘাঁটি ছিল। তারা দেশের গরিব চাষাভুষোদের ওপরে যেমন খুশি অত্যাচার করত। জোর করে জমিতে নীল চাষ দেওয়াত,—যে প্রজা রাজি হত না, চাবুক মেরে তার পিঠের চামড়া তুলে দিত, ঘর-বাড়ি আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দিত। সাক্ষাৎ শয়তানের অবতার ছিল তারা।

কিন্তু দেশের লোকের রক্তও একদিন গরম হয়ে উঠল বাবুজী। মানুষ কতদিন পড়ে পড়ে খালি মার খাবে? গোরু-ঘোড়াকেও বেশি খোঁচালে তারা গুতো মারতে কিংবা চাঁট ছুড়তে চেষ্টা করে, আর এরা তো মানুষ। আশেপাশে দশখানা গাঁয়ের মাথা ছিল বিশাই মণ্ডল, সেই প্রথম বলে বসল, আর আমরা নীলের চাষ করব না। ওতে যা হওয়ার তাই হল, বিশাই মণ্ডলকে আর পাওয়া গেল না। খবর এল, সায়েবেব লোকেরা নাকি তার ধড়ের থেকে মুণ্ডু আলাদা করে মহানন্দা নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে।

শুকনো খড়ের মতো মানুষগুলো তাতিয়ে ছিল, তাতে যেন দেশলাইয়ের আগুন ধরল। আরম্ভ হয়ে গেল প্রলয় কাণ্ড। নীলকরদের সঙ্গে প্রজাদের লড়াই লাগল। ওদের বন্দুক, পিস্তল, এদের তীর-ধনুক, ল্যাজা, টাঙি। দেশের মানুষ সব এককাট্টা হয়ে দাঁড়িয়েছে—গুলি খেয়ে মরল, তবু হার মানল না। ক'দিন পরেই নীলকরেরা তল্পি-তল্পা তুলে পালিয়ে বাঁচল।

কিন্তু সেখানেই জের মিটল না। সরকারের ফৌজ এল। দেশের মানুষগুলো তখন লড়ায়ে পল্টন হয়ে গেছে—দিনের পর দিন বন-জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে লড়াই করতে লাগল। বিপদ দেখে সরকার এখানে ইস্টিশন বসিয়ে দিলে—যাতে ফৌজ আমদানি করতে অসুবিধে না হয়। তখন ধীরে ধীরে অবস্থা ঠাণ্ডা হয়ে এল, কতক ফৌজের গুলিতে মরে গেল, কতককে ধরে ফাঁসিতে লটকে দিলে।

—আর নীলকুঠি?—গণেশবাবু সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

—তারাও সেখানেই শেষ হল বাবুজী—গিরিধারী হাসল।

বললে, অনেক মানুষ জান দিলে বটে, কিন্তু সে-শয়তানেরও দফা নিকেশ করে দিয়ে গেল। সায়েবরা সেই যে পালাল আর এ-মুখো হয়নি—গিরিধারী একটা নিঃশ্বাস ফেললে : সে-সব মানুষ আর নেই বাবুজী। এখন যারা আছে তারা ভয়েই কাবু, গায়ে তাকত নেই, বুকে পাটাও নেই।

গণেশবাবু বললেন, সে-নীলকুঠির বাড়িটা?

—এখন জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে নদীর ধারে। ভয়ানক ভূতের আস্তানা। লোকে সেদিকে এগোয় না।

গণেশবাবু চুপ করে ভাবতে লাগলেন। ভূতের কথা নয়—সেইসব মানুষের কথা—যারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্যে একদিন বন্দুক-পিস্তলের মুখে অসঙ্কোচে বুক পেতে দিয়েছিল আর সেই অন্যায়কে দূর করে দিয়ে তবেই ক্ষান্ত হয়েছিল। সে-রকম দরাজ চওড়া-বুকওয়ালা মানুষ দুনিয়া থেকে কি লোপাট হয়ে গেল নাকি? তারা কি আর ফিরবে না!

ঘরের মধ্যে টেলিফোনটা ঘটাং করে উঠল। গণেশবাবুর চিন্তার জাল ছিড়ে গেল, তিনি ফোন ধরলেন।

হ্যালো, হ্যালো, থ্রি-নাইটি-থ্রি? ফাইভ নাইন—

ঘর থেকে বেরিয়ে বললেন, ঘণ্টা দে গিরিধারী, মিলিটারি স্পেশাল আসছে, পাখা নামিয়ে দে।

ঝনঝন করে রেল-লাইনের পাশে সিগন্যালের তারে টান পড়ল—সিগন্যালের সবুজ চোখ মিলিটারি স্পেশ্যালকে জানাল আসবার সঙ্কেত। তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই সার্চলাইটের আলোয় বান ডাকিয়ে আর লোহায় লোহায় যেন ঝড় তুলে মিলিটারি স্পেশাল ছুটে বেরিয়ে গেল। ছোট স্টেশন মানিকপুরে তার থামবার কথা নয়, সে থামলও না।

গিরিধারী বললেন, বাবু, আমি একটু মাঠ থেকে আসছি।

—আচ্ছা যা।

গণেশবাবু একা বসে বিড়ি ফুঁকছেন—হঠাৎ বাইরে প্রকাণ্ড দীর্ঘশ্বাসের মতো একটা শব্দ উঠল। আর সঙ্গে-সঙ্গেই এক ঝলক দমকা হাওয়া প্ল্যাটফর্ম থেকে একরাশ ধুলো-বালি-কাঁকর এনে যেন গণেশবাবুর চোখে-মুখে ছড়িয়ে দিলে। ঝড় এল নাকি? ধড়ফড় করে উঠে বসতেই গণেশবাবু ভয়ে বিস্ময়ে চমকে উঠলেন। আধখোলা দরজার পিতলের হাতলের ওপরে একখানা কালো হাত। সে-হাতের মালিককে দেখা যাচ্ছে না—বাইরের অন্ধকারে সে মিশিয়ে আছে অথবা আদৌ তার কোনও অস্তিত্ব আছে কি না সেটাই সন্দেহের বিষয়। অস্বাভাবিক ভয়ঙ্কর সে-হাত। তাতে বাঘের মতো বড় বড় নখ, জানোয়ারের মতো রাশি রাশি লোম। গণেশবাবুর মনে হল যে তিনি ভয়ানক একটা দুঃস্বপ্ন দেখছেন।

সেই হাতটাই যেন রুক্ষ কর্কশ গলায় বললে, সুন্দরপুরের নিতাই সরকারের বাড়ি কোন পথে যেতে হয় বলতে পারো?

গণেশবাবু বললেন, তু-তু-তুমি কে?

হাতটা তেমনি রুঢ় গলায় বললে, তা দিয়ে দরকার নেই তোমার। শুধু আমাকে পথটা বলে দাও, নইলে …

কালো হাতের নখগুলো যেন বাঘের থাবার মতো গণেশবাবুর দিকে এগিয়ে আসতে চাইল।

গণেশবাবুর ধড়ে আর প্রাণ নেই!

—ওই বটগাছের তলা দিয়ে যে-রাস্তা, সেই পথ দিয়ে সোজা এগোলেই—

—ধন্যবাদ—এর পুরস্কার তুমি পাবে।

পরক্ষণেই ভতি-বিহ্বল চোখ মেলে গণেশবাবু দেখলেন, রোমশ কর্কশ কালো হাতখানা দরজার হাতলের ওপর থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে।

দুই

সুন্দরপুরের নিতাই সরকার অঘোরে ঘুমুচ্ছিল। মেঘের জমাট রাত। ঝড়-বৃষ্টির একটা কিছু ঘনিয়ে আসছে, কিন্তু এখনও স্পষ্ট করে বোঝা যাচ্ছে না। শুধু বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে—বাইরে নিমগাছে একটি পাতাও নড়ছে না। আর দূরের একটা বটগাছে যেখানে বকের বাসা আছে, সেখানে হঠাৎ ঘুমভাঙা ছানাগুলো থেকে থেকে মানুষের গলায় কঁকিয়ে কেঁদে উঠছে।

নতুন দোতলা বাড়ি করেছে নিতাই সরকার। তারই দোতলার একটা কোণের ঘরে নিতাই ঘুমুচ্ছে দক্ষিণের জানলাটা খুলে দিয়ে। অসহ্য গরম বলেই জানলা খুলে রাখতে হয়েছে, নইলে যে এতক্ষণে প্রায় সেদ্ধ করে ফেলত। তবে সাধারণত জানলা বন্ধ করে শোওয়াই তার অভ্যাস।

আরও একটা অভ্যাস তার আছে। কিছুদিন আগে বন্দুকের লাইসেন্স নিয়েছে—তার মাথার কাছে সব সময় সেটা দাঁড়িয়ে থাকে। থাকে টোটাভরা অবস্থাতেই—যাতে হাত বাড়ালেই বন্দুকটাকে সে মুঠোর মধ্যে আঁকড়ে ধরতে পারে, বিছানায় শুয়েই গুলি ছুড়তে পারে শত্রুর ওপর।

অবশ্য পাড়াগাঁয়ে যার অবস্থা একটু ভাল, তার চোর-ডাকাতের ভয় অল্পবিস্তর থাকবেই। তা ছাড়া, দেশেও এখন আকাল চলেছে। নিতাইয়ের মতো দু-চারজনের হাতে পয়সা কড়ি এসেছে বটে, কিন্তু বেশির ভাগই পেট ভরে খেতে পায় না আজকাল। খিদের জ্বালায় চুরিচামারির চেষ্টা তারা তো করেই—কখনও কখনও দুটো-একটা ডাকাতি যে হয় না তাও নয়।

তবু নিতাই সরকারের ভয়টা একটু বাড়াবাড়ি ঠেকে বইকি। বাড়াবাড়ি ছাড়া কী আর? সরকারি থানা আছে এখানে। নিতাইয়ের বাড়ি থেকে সে-থানা আট-দশ মিনিটের রাস্তাও নয়। বেশ বড় গঞ্জ—বহু লোকজনের ঘন বসতি আছে। তা ছাড়া সুন্দরপুর ইউনিয়ন বোর্ডের বেশ মাতব্বর লোক নিতাই সরকার—দারোগা ইয়াসিন মিঞার সঙ্গে তার দহরম-মহরমের খবরটাও সকলেরই জানা। এ হেন নিতাই সরকারের বাড়িতে সহজে মাথা গলাবার সাহসই হবে না চোর-ডাকাতের।

তবু লোকটা সতর্ক হয়ে থাকে অতিরিক্ত মাত্রায়। কোথায় তার মনের মধ্যেই একটা নিঃশব্দ ভয় ঢুকে বসে আছে কে জানে। সন্ধ্যার পরেও নির্জন রাস্তায় একা হাঁটে না। রাত একটু বেশি হয়ে গেলে কোনও অচেনা মানুষের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে না। শোবার আগে প্রত্যেকটা দরজায় সে নিজের হাতে তালা লাগায়—ভারি-ভারি শক্ত তালা।

লোকে কানাযুষো করে। বলে, অনেক টাকা করেছে লোকটা। জমিয়েছে যকের ধন। সেই টাকার জন্যেই এত সব বাতিক দেখা দিয়েছে তার।

কত টাকা? কেউ বলে দশ হাজার, কেউ বিশ হাজার, কেউ পঞ্চাশ হাজার, কারও-কারও মতে আরও ঢের বেশি। মোটের ওপর পাঁচ বছর আগেকার গোলদারি দোকানদার নিতাই সরকারের ভাগ্য যে ফিরেছে তা নিয়ে কারও ভেতর মতভেদ নেই।

লোকে হিংসায় জ্বলে। আর সেই হিংসাটা ভোলবার জন্যই নানাভাবে সান্ত্বনা দেয় নিজেদের।

—আমার টাকাও নেই, ভাবনাও নেই।

—তা যা বলেছ। টাকা থাকলেই আতঙ্ক। খেয়ে সোয়াস্তি নেই, ঘুমিয়ে নিশ্চিন্তি নেই। তার চেয়ে আমরাই বেশ আছি। চোর-ডাকাত আমাদের ফুটোফাটা ঘটি-বাটি কোনওদিন ছুতেও আসবে না।

—সে তো ঠিক কথা। একটা জিনিস তবুও কিছুতেই বোঝা যাচ্ছে না। এত টাকা কোথায় পেল নিতাই সরকার?

ঠিক ওই একটি জিজ্ঞাসাই সকলের মনে ঘুরপাক খায়। কোত্থেকে এত টাকা এল লোকটার? একতলা

মাটির ঘর তার পাকা দোতলা হয়ে উঠল। দু-সের ডাল, এক-সের চিনি, পোয়াটাক কাঁচা লঙ্কা আর গোটাকয়েক পেয়াজ বেচেই কি কেউ এমন করে লক্ষ্মীর অনুগ্রহ পায়? গ্রামের তারু-মুদির দোকান তো অনেক বড়, কিন্তু সেও তো আজ পর্যন্ত মট-কোঠার ওপর টিনের চালা তুলতে পারল না।

দোকান থেকে নিতাইয়ের যে এই অর্থ-সৌভাগ্যটা ঘটেনি—এটা জলের মতো সরল। পাঁচ বছর আগে নিতাই সেই যে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে কলকাতায় চলে গেল, তারপর মাত্র গত বছর সে গ্রামে ফিরেছে। আর ফিরেই গড়ে তুলেছে লোকের তাক-লাগানো এই দালান ; সেইসঙ্গে এমন একখানা মনোহারীর দোকান দিয়েছে সে সাতখানা গাঁয়ের মানুষকে ডেকে দেখানোর মতো। বিলিতি স্নো থেকে হ্যারিকেন লণ্ঠন পর্যন্ত সেখানে কিনতে পাওয়া যায়—শহরকে একেবারে টেক্কা দিয়ে চলে গেছে বলা যেতে পারে। তা হলে আসল রহস্য এই গ্রামে নেই, আছে কলকাতায়। এ-তল্লাটের লোক পারতপক্ষে সুদূর কলকাতা কখনও চোখে দেখেনি। দু-একজন যারা কালীঘাটে পুজো দিতে গেছে, তারা গাড়ি-ঘোড়ার উৎপাত দেখে যেতে-না-যেতেই পালিয়ে এসেছে পৈতৃক প্রাণটি বাঁচিয়ে নিয়ে।

এ হেন ভয়ঙ্কর কলকাতার পথঘাট কি সোনা দিয়ে মোড়া? সেখানে কি টাকা-পয়সা এমন করে ছড়িয়ে রেখেছে যে ইচ্ছে করলেই মুঠোভরা কুড়িয়ে আনা যায়? কে জানে। নিতাই সরকারকে দু-একজন হাবেভাবে কথাটা জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিল। কিন্তু নিতাই একেবারে গাঁক গাঁক করে তেড়ে এসেছে।

—ওসব বাজে কথা আলোচনা করতে এসো না আমার কাছে। নিজেদের কাজকর্ম না থাকে, তারু-মুদির দোকানে গিয়ে তামাক টানো গে।

লোকে তাই মনে মনে বিলক্ষণ চটে আছে নিতাইয়ের ওপর। আড়ালে-আবডালে নানারকম সমালোচনা করে।

—ইস্—তেজটা দাখো না একবার! —সেদিনের নেতাই ছোকরা—ন্যাড়া মাথা, পেটে পিলে এক পো জিনিস মাপতে আধছটাক ওজনে ফাঁকি দিত—সে একেবারে লাটসায়েব হয়ে উঠেছে!

কান থেকে বিড়ি নামিয়ে সেটা ধরাতে ধরাতে একজন বলে, ও আর কিছু নয়—বুঝলে না, গরম ! টাকার গরম!

—টাকার গরম! অত গরম কোনও দিন থাকবে নাকি?

—আরে বাপু, তাই কি থাকে নাকি কোনওদিন। অহঙ্কার বেশি বাড়লে তার পতন অনিবার্য—এই স্পষ্ট কথাটা জেনে রাখো। সেইজন্যেই তো শাস্ত্রে বলছে, "অতি দৰ্পে হতা লঙ্কা অতি মানে চ কৌরবাঃ !"

কিন্তু যাই বলুক—এখন পর্যন্ত নিতাই সরকারের সর্বনাশ হবার মতো কোনও সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না, বরং দস্তুরমত বহাল তবিয়তেই সে আছে—চারপাশের গ্রাম থেকে খদ্দেরের ভিড় বাড়ছে তার মনোহারী দোকানে। যেখানে থেকে সে যাই করুক, আর অহঙ্কার তার যতই বাড়ক, তার অবস্থা এখন উঠতির দিকেই ; পতন হওয়ার মতো কোনও লক্ষণ এখন কোথাও তার চোখে পড়ছে না।

নিতাই সরকারের কিন্তু শান্তি নেই। কী একটা প্রচ্ছন্ন ভয় আছে তার, একটা গোপন আশঙ্কা আছে মনের ভেতরে। ঘুমের মধ্যে কখনও যদি দেওয়ালের গায়ে একটা টিকটিকিও টক টক করে ডেকে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে তার হাতটা চলে যায় বন্দুকের ঠাণ্ডা কঠিন নলটার গায়ে। ওই বকের ছানাগুলোর কান্না শুনতে-শুনতে আচ্ছন্ন চেতনার ভেতরে তার মনে হয় যেন কোথায় কার গোঙানি শুনতে পাচ্ছে সে।

সঙ্গে সঙ্গে সে বিছানার ওপর উঠে বসে। কার মৃত্যু-যন্ত্রণার গোঙানি? কোন অশরীরী ছায়া-মূর্তির কান্না? আচমকা হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বেড়ে যায় তার—সারা গায়ে ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম ফুটে বেরোয়।

ভুল ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেই লজ্জা পায় ! না ! অসম্ভব। মরা মানুষ আর কখনও ফিরতে পারে না। ফেরার কোনও উপায়ই নেই তার। কোথায় কবে ঘুম-জড়ানো চোখে কিসের একটা ছায়া দেখেছিল,তারই অর্থহীন বিভীষিকা তার সব কিছুকে এমনভাবে বিস্বাদ করে রেখেছে।

তবু কি মন মানে? আজও মাথার কাছে হাতের নাগালের মধ্যে বন্দুকটা রেখে সে শুয়েছিল। ঘুমুচ্ছিল

অকাতরে।

দূরের বাঁশবনে শেয়াল ডাকল—রাত বারেটা। সঙ্গে সঙ্গে এতক্ষণের দমকা গুমট ভাবটা গেল কেটে, কোত্থেকে একরাশ ধুলোবালির তরঙ্গ তুলে একঝাপটা ঝোড়ো হাওয়া এল ঘরের মধ্যে। সাঁ-সাঁ করে উঠল স্তব্ধ নিমগাছটা—ঝরঝর করে বটগাছটার ডালপালায় দোলা লাগাতেই ছানাগুলো আর্তনাদ তুলল সমস্বরে।

নিতাই সরকারের ঘুম ভাঙল। ভাঙল আকস্মিকভাবে। আর সঙ্গে সঙ্গেই সে দেখতে পেল...

কিন্তু যা দেখল তাতে সে বিছানার মধ্যে পাথর হয়ে পড়ে রইল। হাত বাড়িয়ে ছুঁতে পারল না বন্দুকটা—দুটো হাতই যেন তার পক্ষাঘাতে অসাড় হয়ে গেছে!

ঘরের মধ্যে একটা মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে। হ্যাঁ—তারই ঘরে। তার চারটে দরজায় শক্ত লোহার তালা সত্ত্বেও দোতলার এই বন্ধ ঘরে সে এসেছে। তার সর্বাঙ্গ একটা কালো আলখাল্লা দিয়ে মোড়া—লণ্ঠনের ক্ষীণ শিখাতে দেখা গেল, আলখাল্লার ফাঁকে তার দুটো চোখ যেন দু-টুকরো জ্বলন্ত কয়লার মতো দপদপ করে জ্বলছে।

মানুষ, না প্রেতাত্মা? চোর, না খুনি?

নিতাই চিৎকার করে উঠতে চাইল, পারল না। গলা থেকে তার সমস্ত স্বর কে যেন একটা ব্লটিং কাগজ দিয়ে শুষে নিয়েছে। শুধু নির্বাক অসহায় চোখে সমস্ত ব্যাপারটা সে দেখতে লাগল। কিছুই করবার উপায় নেই তার—করবার মত শক্তিও নেই কোথাও। সে এখন এই অদ্ভুত আগন্তুকের হাতে সম্পূর্ণ অসহায় শিকার।

মূর্তিটা হঠাৎ একখানা হাত থাবার মতো করে তুলে ধরল। লণ্ঠনের আবছা আলোতেই নিতাই দেখতে পেল—সে হাত মানুষের নয়। তীক্ষ্ণধার তার নখ, রোমশ, কর্কশ তার রূপ, আর—আর সে-হাত টকটকে তাজা রক্তে-মাখানো।

সেই হাতখানা বাড়িয়ে মূর্তিটা তার দিকেই এগিয়ে আসতে লাগল। নিতাই আবার চিৎকার করতে চেষ্টা করল—মনে হল মাত্র তিন হাত দূরেই দাঁড়িয়ে আছে তার মৃত্যু। কিন্তু এবারও সে কোনও স্পষ্ট আওয়াজ করতে পারল না, কেবল গলার মধ্যে তার ঘড়ঘড় করে উঠল। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সে পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইল। আর খোলা জানলা দিয়ে ক্রমাগত ঘরে এসে ঢুকতে লাগল গোঁ-গোঁ করা ঝোড়ো হাওয়ার এক-একটা উদাম ঝাপটা।

মূর্তিটা কাছে এল—এল একেবারে বিছানার কাছে। তারপর রক্তমাখা সেই হাতখানা নিতাইয়ের বুকের ওপর চেপে ধরল। সে-হাতের ছোঁয়ায় তার গায়ের রক্ত জমাট বেঁধে গেল বরফের মতো।

ফিসফিস করে লোকটা বললে, আমায় চিনতে পারো?

নিতাই জবাব দিলে না। জিভটা তার টাকরার সঙ্গে আঠার মতো লেপটে গেছে।

—আমি শ্বীমন্ত রায়। —তেমনি ফিসফিস করে বললে লোকটা, তার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিংস্র একটা হাসির রেশও যেন বেজে উঠল।

বিদ্যুতের চমক খাওয়ার মতো করে নিতাইয়ের পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিউরে গেল।

—আমায় এখানে তুমি আশা করোনি—না?

নিতাইয়ের ঠোঁট দুটো একবার নড়ে উঠল। কিছু বলতে চেষ্টা করল।

—কিন্তু আশা না করলেও অযাচিতভাবেই দেখা দিতে এসেছি। এতদিনের এমন নিবিড় বন্ধুত্ব—মায়া কাটানো কি এতই সহজ? উৎসবে, ব্যসনে, শ্মশানে—সব জায়গাতেই বন্ধুর কাছাকাছিই থাকা উচিত—কী বলো?

কে বলবে? বলবার মতো অবস্থা নিতাই তখন হারিয়েছে। তার সমস্ত চেতনা যেন লুপ্ত হয়ে যাওয়ার উপক্রম।

—ভেবেছিলে, পালাবে? পালিয়ে বাঁচবে তিনশো মাইল দূরের এই পাড়াগাঁয়ে? কিন্তু অত সহজেই কি আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায়? আমার জন্যে যা তুমি করেছ, সে-ঋণ শোধ করবার জন্যে দরকার হলে তোমাকে খুঁজতে আমি নরকে পর্যন্ত যেতে রাজি ছিলাম, বন্ধু! এই সুন্দরপুর আর কতটুকুই বা রাস্তা সে তুলনায়?

নিতাইয়ের একটা হাত নড়তে লাগল। বন্দুকটা ধরবার অন্তিম চেষ্টা করল যেন । কিন্তু আলখাল্লার ফাঁকে দুটো চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টিতে সে ক্রমেই সম্মোহিত হয়ে যাচ্ছে। শরীরের একটি স্নায়ুপেশীও তার বশে নেই।

শ্বীমন্ত রায় বললে, শোনো। আমার পাওনাগণ্ডা এই মুহূর্তে মিটিয়ে নিতে পারতাম। কিন্তু তা আমি করব না। অপ্রস্তুত অবস্থায় শোধ নেওয়াটা তোমাদের মতো কাপুরুষের ধর্ম হতে পারে, কিন্তু তা আমার নয়। তিন দিন সময় আমি তোমাকে দিলাম। অনুতাপের যা-কিছু সুযোগ এর মধ্যেই তুমি পাবে। তারপর আমি আবার আসব। সেদিন, জেনে রেখো, আমার হাত থেকে কিছুতেই তোমার পরিত্রাণ নেই।

বাইরে আবার হাওয়া গো-গোঁ করে উঠল। গোঙিয়ে উঠল বকের ছানারা। সেই মুহূর্তেই হঠাৎ জানলার কাছে সরে এল শ্বীমন্ত রায়। অসাড় চোখের দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিতাই দেখতে পেল, খোলা জানলা দিয়ে বিদ্যুদ্বেগে শ্বীমন্ত হারিয়ে গেল অন্ধকারে, শুধু অনেক নীচে ধূপ করে শব্দ হল।

কড় কড় করে বাজ ডেকে গেল আকাশে। চোখ ধাঁধিয়ে গেল একরাশ অতি তীব্র বিদ্যুতের আলোয়। সেই আলোয় নিতাই দেখলে, অমানুষিক শক্তির সাহায্যে লোহার শক্ত গরাদ দুধারে বাঁকিয়ে দিয়ে তার ভেতর দিয়ে কেউ ঘরে ঢোকবার পথ করে নিয়েছে।

প্রায় দশ মিনিট পরে বাঁশপাতার মতো কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসল নিতাই। হাত বাড়িয়ে চড়িয়ে দিল লণ্ঠনের আলো।

তিন

সকালে স্টেশনে কাজ ছিল না। নাইট-ডিউটির পরে বেলা বারোটা পর্যন্ত কোয়াটারে টানা ঘুম লাগালেন গণেশবাবু। কিন্তু নিশ্চিন্ত নিদ্রা নয়—থেকে থেকে কেমন একটা দুঃস্বপ্নে যেন তিনি আঁতকে উঠছিলেন। অন্ধকার অমাবস্যার রাত—প্ল্যাটফর্মে মিটমিটে আলোয় দরজার হাতলের ওপরে একখানা হাত এসে জেকে বসেছে বাঘের থাবার মতো । রোমশ–কর্কশ—ভয়ঙ্কর।

একখানা কালো হাত। পৃথিবীর যত হিংসা আর বিভীষিকা যেন সেই হাতে যেন সামনে যাকে পাবে, তারই গলা টিপে ধরবে।

বেলা বারোটার সময়ে এই অস্বস্তিকর ঘুম থেকে গণেশবাবু উঠে বসলেন। হাত-মুখ ধুয়ে পুরো দুপেয়ালা চা আর চারটে ডিম খেয়ে প্রাতরাশ করলেন। মোটা মানুষ, বেশ খেতে পারেন—খেতে ভালোও বাসেন। আর লোভের জন্যেই না তাঁর এই দুর্গতি। দিব্যি ছিলেন শিয়ালদা স্টেশনে, কী কুক্ষণেই যে হতভাগা গোমেজের পাল্লায় পড়ে প্রফেসার ভাদুড়ীমশায়ের ল্যাংড়া আমেই তাঁর নজর গেল—

কিন্তু রাত্রে তিনি ও কী দেখলেন। স্বপ্ন, না সত্যি? গণেশবাবু ব্যাপারটা এখনও বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না। জেগে জেগে স্বপ্ন দেখা তো তাঁর অভ্যেস নয়। গাঁজা তিনি খান না—কোনও ভদ্রলোকেই খায় না। অল্প বয়সে দেশের বাড়িতে বিজয়া দশমীর দিন একবার সিদ্ধি খেয়েছিলেন। সিদ্ধির লোভে নয়—এক-এক গ্লাস সিদ্ধির সঙ্গে দুটো করে নাটোরের রসগোল্লা বরাদ্দ ছিল। তারই আকর্ষণে গ্লাস-তিনেক সিদ্ধি টেনে যে-দুর্গতি তাঁর হয়েছিল সে-কথা আজও স্পষ্ট মনে আছে। দুদিন বেহুঁশ হয়ে পড়ে ছিলেন, আর স্বপ্ন দেখেছিলেন—একটা পাটকিলে রঙের মস্ত রামছাগল শিং নেড়ে তাঁর ভুড়িতে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। দুদিন ধরে এমনি ভয়ঙ্করভাবে তিনি হেসেছিলেন যে তারপরে এক হস্তা তিনি ভাত পর্যন্ত খেতে পারেননি—এত ব্যথা হয়েছিল চোয়ালে।

কাল রাত্রে তিনি তো সিদ্ধি খাননি। তবে কী ব্যাপার। গণেশবাবু বারকয়েক মাথা ঝাঁকড়ালেন। নাঃ—স্বপ্নই বটে। এমন ব্যাপার কখনও সত্যি হতে পারে। সত্যি হওয়া অসম্ভব। মিছিমিছি ও নিয়ে তিনি আর মাথা ঘামাবেন না। দেওয়াল-ঘড়িতে সাড়ে বারোটা বেজেছে। পৌনে একটায় দুখানা গাড়ির ক্রসিং হয় মানিকপুরে। একবার স্টেশনে যাওয়া দরকার।

কোম্পানির নাম-লেখা চাঁদর-বোতাম-অটো শাদা জিনের কোটটা গায়ে চড়ালেন গণেশবাবু। তারপর চটিটা পায়ে দিয়ে গজেন্দ্রগমনে এগিয়ে চললেন স্টেশনের দিকে।

স্টেশনের পাশেই সিগন্যাল নেমে পড়েছে—ট্রেনের আর দেরি নেই।

স্টেশনের পেছন দিয়েই একটা মেটে পথ। তার দুধারে উঁচু উঁচু টিলা ডানদিকে একটি বুরি-নামা বটগাছ ছায়ার অন্ধকার করে চিত্রগুপ্তের মতো দাঁড়িয়ে। কোন আদ্যিকালের গাছ—তার বয়েসের যেন ঠিক-ঠিকানা নেই। সেই গাছের নীচে সিঁদুর-লেপা একটা থান। হাত-পা-ভাঙা কালো কষ্টিপাথরের একটা মূর্তি। কার্তিকী অমাবস্যায় দূর দূর গ্রাম থেকে লোক এসে রঙ্কিণী-কালীকে পুজো করে যায়।

গাছটার দিকে তাকিয়েই আজ যেন গা ছম-ছম করে উঠল। ওর তলা দিয়েই মেটে রাস্তাটা চলে গেছে সুন্দরপুর পর্যন্ত। আশেপাশে আর জন-মানুষের বসতি নেই। ওই পথ দিয়েই কালো হাতখানা গেছে। কোথায়? সুন্দরপুরের নিতাই সরকারের বাড়িতে।

গণেশবাবুর মাথাটা আবার ঝিমঝিম করতে লাগল। স্টেশনের ওপাশে মালগুদাম, তার নীচে দিয়ে বন জঙ্গল ঢালু হয়ে নেমে গেছে—কাদায় আর গোখরো সাপে ভরা এলোমেলো বিল আর বুনো ঘাসের একটা উচ্ছৃঙ্খল জগৎ। মাঝে মাঝে পেত্নীর মতো তেঠেঙে চেহারার শ্যাওড়া গাছের সারি। ওখানে—ওই জলার জঙ্গলে কী যে নেই, এক ভগবানই বোধকরি সে-কথা বলতে পারেন; শেয়াল আছে, বুনো শুয়োর আছে, শোনা যায় বাঘও আছে । আর হয়তো দলে দলে মামদো আছে, স্কন্ধকাটা আছে—যারা খুশিমতো এক-

একখানা কালো হাত বাড়িয়ে—

গণেশবাবু আর ভাবতে পারলেন না। বাঁকের মুখে আচমকা একটা তীক্ষ্ণ রেলের বাঁশি। গণেশবাবু হঠাৎ চমকে উঠলেন। ঝরাং ঝরাং ঝিপ ঝিপ শব্দ করতে করতে একখানা গাড়ি এসে স্টেশনে ভিড়ল। ওদিকে আর-একটা হুইসেল। আর একখানা ট্রেনও এসে পড়ল বলে।

গণেশবাবু জোর পা চালিয়ে দিলেন।

স্টেশনে ঢুকতেই গিরিধারীর সঙ্গে দেখা।

—মাস্টারবাবু, দুজন লোক আপনাকে খুঁজছে।

—আমাকে? গণেশবাবু ভু কঁচকোলেন। —কারা রে?

—তা তো জানি না। দুজন ভদ্রলোক।

—ভদ্রলোক ! সেকি ! কোথায়?

—ওয়েটিং রুমে বসে আছে। ডাউন গাড়ি থেকে নেমেছে।

গণেশবাবু দাঁড়িয়ে পড়লেন। মনটা চিন্তায় ভরে উঠেছে মুহূর্তে। এই অজগর জঙ্গলে কারা তাঁকে খুঁজতে এল? এমন আত্মীয়ই বা তাঁর কে আছে? কলকাতা থেকে আত্মীয়স্বজন যদি কেউ খুঁজতে এসে থাকে—তারাই বা চিঠিপত্র না দিয়ে এমন করে চলে আসবে কেন? আর যদি বা এসেও থাকে তা হলে সোজা তাঁর কোয়াটারেই তো চলে যেতে পারে—এখানে বসে থাকবে কোন দুঃখে?

সাত-পাঁচ ভেবে গণেশবাবু ওয়েটিং রুমে ঢুকলেন।

নামেই ওয়েটিং রুম। একটা পুরনো ওভাল-শেপ কাঠের টেবিল, তার ওপরে আধ ইঞ্চি ধুলো জমে আছে। একটা ডেক-চেয়ার আছে বছর ত্রিশেক আগেকার, তার বেতের ছাউনি বারো আনার মত খসে পড়ে গেছে । আর একটা বেঞ্চি আছে একপাশে—দরকার হলে সেখানে পড়ে পড়ে গিরিধারী নাক ডাকায় ।

দুটি যুবক সেখানে বসে সিগারেট টানছিল।

গণেশবাবু ঘরে ঢুকতেই তারা উঠে দাঁড়াল, তারপর নমস্কার করলে। গণেশবাবুও প্রতি-নমস্কার জানালেন।

একজন সাহেবি পোশাক পরা, চোখে সোনার চশমা। বেশ প্রিয়দর্শন চেহারা–চোখে তীক্ষ্ণধার বুদ্ধির আলো। সেই ই আলাপ আরম্ভ করলে।

—আপনি গণেশবাবু?

গণেশবাবু সবিনয়ে বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ।

—এখানকার স্টেশনের ইনচার্জ বুঝি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ । আপনারা?

—বলছি। —সাহেবি পোশাক পরা যুবকটি বললে, বসুন না। সিগারেট নিন। আপনার সঙ্গে একটু জরুরি ব্যাপার আছে।

জরুরি ব্যাপার। গণেশবাবুর বুকটা ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। এরা কারা? এইরকম একটা জংলি স্টেশনে দুটি বিশিষ্ট লোকের হঠাৎ আসবার হেতুই বা কী? কেমন যেন সন্দেহে গণেশবাবুর মাথাটা ঘুরতে লাগল।

গণেশবাবু বেঞ্চিটার ওপরে বসলেন। দ্বিধাভরে একটা সিগারেট নিয়ে ধরালেন। তারপর আবার

জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা আসছেন কোত্থেকে?

এবার জবাব দিলে দ্বিতীয় যুবকটি। এ সাহেবি পোশাক পরা নয়, কিন্তু এরও বেশবাসে যথেষ্ট পারিপাট্য আছে। তা ছাড়া এ-লোকটির একটা একটা বিশেষত্বও এতক্ষণে গণেশের চোখে পড়ল। মস্ত জোয়ান। পাতলা সিল্কের পাঞ্জাবির নীচে তার শরীরের লোহার মত মাসূলগুলো ফুলে ফুলে উঠেছে। মাথার চুলগুলো কড়া, তামাটে। গাল দুটো ভাঙা, চোয়ালের হাড় খড়্গের মতো খাড়া হয়ে আছে। মুখের হাঁকড়াটা যেন একটু বেশি বড়—সব মিলিয়ে যেন একটা ভয়ানাক চেহারার বুলডগের আদল আসে। প্রথম লোকটির চাইতে এর বয়সও একটু বেশি মনে হল।

গম্ভীর গমগমে গলায় সে বললে, কলকাতা ।

—কলকাতা? তা এখানে কী কাজে? কোথায় যাবেন?

—দাঁড়ান, ব্যস্ত হবেন না—দ্বিতীয় লোকটি সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে বেশ রহস্যমণ্ডিত হাসি হাসল ; কাছাকাছি কোথাও ডাকবাংলা আছে বলতে পারেন?

—আছে, সুন্দরপুরে। মাইল পাঁচেক দূরে হবে।

—সুন্দরপুর। নতুন লোক দুটি যেন একসঙ্গে চমকে উঠল। সাহেবি পোশাক পরা যুবকটি সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে খানিকক্ষণ অন্যমনস্কের মতো তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে। বললে, না, সেখানে চলবে না। এই ওয়েটিং রুমেই আমরা দিনকয়েক কাটাতে চাই। কী বলেন গণেশবাবু? .

গণেশবাবু বিব্রত হয়ে বললেন, তা কেমন করে হবে? রেল কোম্পানির আইন আছে তো একটা। থাকতে দেবে কেন?

দ্বিতীয় লোকটি সশব্দে হেসে উঠল। বাইরে ট্রেন দুটো অনেকক্ষণ আগেই স্টেশন ছড়িয়ে চলে গেছে, দুপুরের রোদে ঝাঁ ঝাঁ করছে নির্জনতা। তার হাসির শব্দে চারিদিকের স্তব্ধতা যেন দুলে উঠল।

—আইন আপনাকে কিছু বলবে না। আমরাও আইনের তাগিদেই এসেছি। পুলিশের লোক আমরা—ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ।

গণেশবাবু সভয়ে উঠে দাঁড়ালেন। —অ্যাঁ—তাই নাকি ! মাপ করবেন, বুঝতে পারিনি। কিছু মনে করবেন না, স্যার।

প্রথম যুবকটি বললে, না না, মনে করব কেন। আপনাকে আমাদের চাই, একটা অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপারে আপনি আমাদের হেলপ করবেন। একটা সাসপেক্টেড খুন, প্রচুর টাকা চুরি এবং তার সঙ্গে কিছু রাজনৈতিক গণ্ডগোল—সব মিলিয়ে জিনিসটা পুলিশ-বিভাগে মস্ত একটা গোলক-ধাঁধা হয়ে আছে। আপনি আমাদের সাহায্য করবেন নিশ্চয়ই?

গণেশবাবুর ঘাম ছুটতে লাগল। সাসপেক্টেড খুন, প্রচুর টাকা চুরি এবং রাজনৈতিক গণ্ডগোল ভয়ে তাঁর তোতলামি বেরিয়ে গেল : আ—আ—আমি ক-ক-কী সাহায্য করব?

—সে আমরা দেখব। ভাবনার কোনও কারণ নেই আপনার। যদি কাজটা করে ফেলতে পারি, আপনিও পুরস্কারের অংশ পাবেন।

পুরস্কারের অংশ। সঙ্গে সঙ্গে গণেশবাবু শিউরে উঠলেন। পুরস্কার। কালো হাতও তাঁকে বলে গেছে পুরস্কার দেবে। কিন্তু পুরস্কারের নমুনা যা দেখা যাচ্ছে, এখন ৰৰক্ষতালু ফুড়ে প্রাণটা বেরিয়ে না গেলেই তিনি বাঁচেন। উঃ গোমেজ.হতভাগা গোমেজ ! তার জন্যেই না তাঁকে আজ এই দুর্বিপাক ভোগ করতে হচ্ছে।

গণেশবাবু দাঁড়িয়ে রইলেন। সাহেবি পোশাক পরা যুবকটি বললে, আমাদের পরিচয়টাও আপনার জানা দরকার। আমি এ-লাইনে ইন্সপেক্টর, অনাদি ঘোষাল আমার নাম। আর ইনি বিরিঞ্চি চক্রবর্তী, আমার সহকর্মী।

গণেশবাবু এতক্ষণে যেন কথা খুঁজে পেলেন।

—তা হলে আপনাদের খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্তটা—

—কিছু ব্যস্ত হবেন না, আমাদের সঙ্গে চাল-ডাল, আলু আর কুকার আছে, ওতেই চলে যাবে। আপনি একটু জলের বন্দোবস্ত—

—না, না—সে কি হয় —হন-হন করে গণেশবাবু চলে গেলেন। ভয়, অস্বস্তি আর অশান্তিতে তাঁর সমস্ত মনটা কলাপাতার মতো কাঁপছে।

গণেশবাবু বেরিয়ে যেতে অনাদি আর বিরিঞ্চি ঘন হয়ে বসল।

অনাদি বলল, কেমন দেখলে হে ভদ্রলোককে?

বিরিঞ্চি চট করে উঠে গেল। একবার মুখ বাড়িয়ে দেখে নিলে কেউ আছে কি না। তারপর দরজাটা বন্ধ করে ফিরে এল অনাদির কাছে।

—গণেশবাবুর কথা বলছিলে তো? লোকটা একেবারে গবেট!

—কাজ হবে?

—হুঁ অনায়াসে। মাথায় কাঁটাল তো দূরের কথা, নারকেল আছড়ে ভাঙলেও টু করবে না।

—এক টিলে দুপাখি মারতে হবে। শেয়ারে অন্তত পাঁচ হাজার করে আমাদের পাওয়া উচিত, কী বলো?

—নিশ্চয়, আর মেল ট্রেন থেকে যা পাওয়া যায় সেটা উপরি। অনাদি আর-একটা সিগারেট ধরাল। চিন্তিত মুখে বললে, কিন্তু বড় দুঃসাহসিক হচ্ছে। শেষরক্ষা করতে পারলে হয়। তা ছাড়া, আমার মনে হয় শ্বীমন্ত রায় বেঁচে আছে।

—অসম্ভব । আমার সামনেই সে ছোরা খেয়ে গিয়েছিল মাটিতে—রক্তে ভেসে গিয়েছিল সব। আর বেঁচেই যদি থাকে—তাতেই বা ক্ষতি কী। পঞ্চাশ রাউন্ড করে রিভলবারে গুলি আছে আমাদের, ভুলো না —হাঃ—হাঃ—হাঃ । বিরিঞ্চি রাক্ষসের মতো হেসে উঠল।

—হাঃ-হাঃ—হাঃ— পরক্ষণেই বাইরে থেকে তেমনি একটা হাসির প্রতিধ্বনি। অনাদি আর বিরিঞ্চি একসঙ্গেই লাফিয়ে উঠল দুজনে। মুহূর্তের মধ্যে পকেট থেকে একটা রিভলবার বার করলে বিরিঞ্চি । দুজনের মুখ থেকেই সমস্বরে বেরোল : কে হাসল অমন করে?

সবেগে দুজনে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ছাইয়ের মতো বিবর্ণ হয়ে গেছে তাদের চেহারা।

নির্জন স্টেশন। দুপুরের রোদে তার কাঁকর আর লাইনের ইস্পাত জ্বলছে। ওপাশে ঢালু জমিতে যতদূর চোখ যায় বিল আর জঙ্গল। স্টেশনমাস্টারের ঘরে লোক নেই, শুধু একটা রেলের কুলি প্ল্যাটফর্ম ঝাঁট দিচ্ছে মন দিয়ে। বুড়ো মানুষ, মাথার চুলগুলো শাদা। এত নির্বিকার, যে...

বিরিঞ্চি বাঘের মতো গলায় ডাকল, এই কুলি।

কুলিটা দাঁড়িয়ে উঠে একটা সেলাম ঠুকল। বললে, ক্যা হুকুম হুজুর।

—কে এখানে হাসল?

—কোই নেই হুজুর ।

—কোই নেই?

—না হুজুর ।

—হাসি শোনোনি?

—নেহি হুজুর। আপলোককা ভুল হুয়া হোগা।

—ভুল হয়া হোগা। দুজনেই সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল কুলিটার দিকে। ভুল হবে? দু'জনেরই একসঙ্গে? কেমন করে সম্ভব। তবে কি প্রতিধ্বনি? কিন্তু—

—তোমার নাম কী ?

—গিরিধারী হুজুর। আজ দশ বছরের বেশি হল এইটিশনে আছি।

—আচ্ছা যাও।

—সেলাম হুজুর —ঝাঁটাটা তুলে নিয়ে গিরিধারী চলে গেল।

ওয়েটিং রুমের বাইরে অনাদি আর বিরিঞ্চি এ-ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। পাথরের গড়া মূর্তির মতো ভাষা জোগাচ্ছে না।

চার

মিনিট পাঁচেক প্ল্যাটফর্মে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অনাদি আর বিরিঞ্চি । দুজনেই কি একসঙ্গে ভুল শুনল? তাও কি সম্ভব? সিল্কের পাঞ্জাবির নীচে হুলো বেড়ালের মতো বিরিঞ্চির মাংসল পেশল শরীরটা ফুলে ফুলে উঠছে। হাতের মুঠোর মধ্যে রিভলবারটা কেমন একটা শব্দ করল—যেন দাঁত কড়কড় করছে। যাকে সামনে পাবে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে তাকে।

অনাদির মুখটা যেন পাঙাশ হয়ে গেছে। হাঁটু দুটো কাঁপছে ঠকঠক করে। ফিসফিস করে অনাদি বললে, ও কে হাসল? শ্বীমন্ত রায়?

কিন্তু বিরিঞ্চি নিজেকে সামলে নিলে। হঠাৎ অনাদির কাঁধে মস্ত বড় থাবড়া দিলে একটা।

—খেপেছ তুমি? যে-লোক আমার সামনে মরে গেছে সে এখানে আসবে কেমন করে?

—কিন্তু সত্যিই মরেছে তো?

বিরিঞ্চি যেন ধমক দিয়ে উঠল, ও-সব কী কুসংস্কার তোমার? মরেনি তো মরেনি। তাই বলে সে এখানে এসে জুটবে কেমন করে?

—তা হলে ও-হাসি কার?

—কোনও পাগল-টাগলের হবে বোধহয়।

—বোধহয়।

মনের দিক থেকে এ-ছাড়া সান্তনা পাওয়ার কিছু ছিল না। .

মেঘের মত মুখ নিয়ে দুজনে ওয়েটিং রুমে ঢুকল। বিরিঞ্চির সমস্ত কপাল চিন্তায় রেখায়িত হয়ে উঠেছে —অনাদির চেহারায় এখনও স্বাভাবিকতা ফুটে ওঠেনি। ঘরে ঢুকে অনাদি ডেক-চেয়ারটায় গা এলিয়ে দিয়ে ক্লান্তের মতো শুয়ে পড়ল আর বিরিঞ্চি একটা টেবিলের ওপরে পিঠ খাড়া করে বসে কী যেন চিন্তা করতে লাগল।

বাইরে রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করছে। রেল-লাইনের পাশে টেলিগ্রাফের তারে একটা শঙ্খচিল চাঁ-চাঁ করে উঠল— ভারি অলুক্ষণে ডাক। রঙ্কিণী-কালীর থানের ওপরে ঝাঁকড়া বটগাছটা অন্ধকার করে দাঁড়িয়ে—বাতাসে তার পাতাগুলো ঝরঝর করছিল।

নিরুত্তরে দুজনে দুটো সিগারেট ধরাল। হাসির কথাটা মন থেকে মুছে ফেলবার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না।

অনাদি বললে, আমার ভাই ভালো লাগছে না একটুও।

বিরিঞ্চি ভ্রুকুঞ্চিত করলে ; কেন?

—মনে হচ্ছে সুবিধে হবে না। বিপদে পড়ব।

—বিপদ? –বিরিঞ্চি সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল : দুটো রিভলবার আর দুশো কর্তুজ আছে সঙ্গে। এই মেড়োর দেশে এসেও যদি কাজ গুছিয়ে নিতে না পারি, তাহলে মানুষ হয়ে জন্মেছি কেন বলতে পারো?

— হুঁ। —অনাদি গম্ভীর হয়ে রইল।

নির্জন স্টেশনের ওপরে দুপুরের রোদ জ্বলছে। চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে লাইন পেরিয়ে একটা ঢালু জমি প্রসারিত হয়ে গেছে দিগন্ত পর্যন্ত। তার ওপর জঙ্গল আর জঙ্গল। কালো কালো ডানা আকাশে মেলে দিয়ে উড়ে চলেছে শামকল পাখির ঝাঁক।

হাতের রিভলবারটা নিয়ে বিরিঞ্চি খেলা করতে লাগল। একবার তাকাল বাইরের দিকে। বললে, হাতে দুটো কাজ এখন। নিতাই সরকারের কাছ থেকে দশ হাজার টাকা আদায় করতে হবে। দু নম্বর—মেল ট্রেন।

অনাদি বললে, তিন নম্বর কাজেরও দেখা পাবে। মনে করো যদি শ্ৰীমন্ত রায় এসে সামনে দাঁড়ায়—বলে—

—হ্যাং ; ইয়োর শ্রীমন্ত রায়! —বাঘের মতো গর্জন করে বিরিঞ্চি মাটিতে দাঁড়িয়ে পড়ল। বললে, আসে আসুক—এই রিভলবারের মুখে—

কিন্তু এবারেও বিরিঞ্চির কথা শেষ হল না।

সমস্ত স্টেশনটা কাঁপিয়ে হঠাৎ একটা প্রচণ্ড অট্টহাসির ঝড় উঠল । হোঃ—হোঃ—হোঃ ! অমানুষিক, নৃশংস আর ভয়ঙ্কর হাসি। সে হাসিতে এই দিন-দুপুরেও দুজনের গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেল সজারু-কাঁটার মতো।

কিত হয়ে দুজনে পেছন ফিরে তাকাল। যা দেখল তা বিশ্বাস করবার মতো নয়। ওয়েটিং রুমের কাচের জানলার পাল্লার ওপর থেকে নক্ষত্র-গতিতে একখানা হাত সরে গেল। সে-হাত সাধারণ মানুষের হাতের প্রায় দ্বিগুণ। তার রং কালির মতো কালো, রোমশ, কর্কশ আর ভয়ঙ্কর।

বিস্ফারিত চোখ মেলে দুজনে তাকিয়ে রইল সেদিকে। পরক্ষণেই আর-একটা। আতঙ্কের উপর আতঙ্ক।

খোলা জানলা দিয়ে প্রকাণ্ড একটা শাদা গোলার মতো কী ছিটকে এল ওদের দিকে—ক্র্যাশ করে আছড়ে পড়ল মেঝেতে, তারপর ঘরময় গড়িয়ে গেল ফুটবলের মতো।

একটা নরমুণ্ড। তার বিকট দাঁতগুলো ছরকুটে আছে—যেন কামড়াতে চায়। আর তার সঙ্গে আটা একটা শাদা কাগজ—তার ওপরে প্রকাণ্ড একখানা হাতের ছাপ—রক্তমাখা হাতের ছাপ।

মাত্র কয়েক মুহূর্ত। তারপরেই জানালার দিকে পাগলের মতো ছুটে গেল বিরিঞ্চি। বাইরে হাত বাড়িয়ে ট্রিগার টিপল রিভলবারের।

গুড়ুম—গুড়ুম—

সমস্ত স্টেশনটা থরথর করে উঠল। আর দূরে প্ল্যাটফর্মের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে নিবিষ্ট মনে খৈনি টিপতে লাগল গিরিধারী।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে সমস্ত লোক জমা হয়ে গেল ওয়েটিং রুমে। অনাদি মূৰ্ছিতের মতো বসে পড়েছে ডেক-চেয়ারে, তার মাথাটা যেন কুমোরের চাকার মতো বোঁ-বোঁ করে ঘুরছে। কিন্তু বিরিঞ্চি অত সহজে বিচলিত হয়নি। শুধু মুহূর্তের জন্যে তারও শরীরটা কেমন করে উঠেছিল, কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়েছে। বোঝা যাচ্ছে শৎৰু আছে কাছাকাছি। কিন্তু সে-জন্যে পিছিয়ে গেলে চলবে না, দুশো রাউন্ড কার্তুজ তারা এনেছে রিভলবারে ব্যবহার করার জন্যে।

ওয়েটিং রুমে লোক জড়ো হওয়ার আগেই সে মড়ার মাথাটা থেকে কাগজখানা খুলে নিলে নিঃশব্দে সেটাকে পুরলে নিজের পকেটে। তারপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

হইহই করতে করতে ছুটে এলেন গণেশবাবু, স্টেশনের ছোকরা বুকিং ক্লার্ক রহমান আর পানিপাঁড়ে রাম সিং। গণেশবাবুর অবস্থা দেখলে দুঃখ হয়। স্নানের উদ্যোগ করছিলেন ভদ্রলোক, হাতে গড়, কানে পৈতে, পরনে গামছা। সেই অবস্থাতে ছুটে এসেছেন তিনি। মোটা মানুষ, এমনিতেই হার্ট দুর্বল! এই দিন-দুপুরে রিভলবারের দু-দুটো আকাশ-ফাটানো শব্দে তাঁর বুকের মধ্যে যে কেমন করছে সে তিনিই জানেন।

—কী হয়েছে? ব্যাপার কী?

সমস্বরে সকলের প্রশ্ন ।

অনাদি কোনও কথা বলতে পারল না, জবাব দিলে বিরিঞ্চি । আঙুল বাড়িয়ে বললে, ওইটে দেখুন।

সর্বনাশ। মড়ার মাথা! তিনজনেই লাফ দিয়ে দরজার দিকে সরে গেল আতঙ্কে। সবচাইতে প্রচণ্ড লাফ দিলেন গণেশবাবু অমন মোটা শরীর নিয়ে অতবড় লাফ তিনি যে কী করে দিলেন এ একটা আশ্চর্য ব্যাপার। তাঁর সেই লম্ফদান দেখলে ক্যাঙারুরও লজ্জা হত। হাতের গড়টা ঠাঁই করে গিয়ে লাগল পানিপাঁড়ে রাম সিংয়ের কাঁকালে, সেও 'আই আই আই দদ্দা' বলে মেঝেতে বসে পড়ল।

মিনিট-খানেক পরে একটু সামলে নিল সকলে।

কাঁপা গলায় গণেশবাবু বললেন, ওটা কী করে এল?

বিরিঞ্চি সংক্ষেপে উত্তর দিলে, জানলা দিয়ে।

—জানলা দিয়ে? কোনও লোকজন—?

—নাঃ—ডেক-চেয়ারে বসে এতক্ষণ পরে সাড়া দিলে অনাদি। দুটো ঘোলাটে চোখ মেলে বললে: শুধু একখানা হাত যেমন বিশ্রী কালো, তেমনি ভয়ঙ্কর। একখানা কালো হাত!

গণেশবাবুর বুকের রক্ত চন-চন করে উঠল। হাত দুটো থর-থর কতে কাঁপতে লাগল। রাম সিং কাঁকালের ব্যথাটা সামলে নিয়ে বললে, রাম, রাম—ই তো কোই জিন কা কারবার হোগা মালুম হোতা!

ঠাঁই। গণেশবাবুর কাঁপা হাত আবার গড়র ধাক্কা লাগল রাম সিংয়ের হাঁটুতে।

—আঁই হে দাদা—মর গেই রে—আর একলাফে রাম সিং বাইরে চলে গেল। গাড়ুটার গতিবিধি তার সুবিধাজনক মনে হচ্ছিল না।

রহমান বললে, দিন-দুপুরে ভূত! এ হতেই পারে না।

বিরিঞ্চি বললে, নিশ্চয়ই না। এ কোনও বদলোকের কাছ। ভালো কথা, আপনাদের স্টেশনের পয়েন্টসম্যান গিরিধারীকে একবার ডাকুন তো!

—গিরিধারী!—গণেশবাবু সবিস্ময়ে বললেন, তাকে কেন?

বিরিঞ্চি কঠিন গলায় বললে, ডাকুন না। দরকার আছে। কিন্তু স্টেশনে গিরিধারীকে পাওয়া গেল না। এদিক-ওদিক খুঁজে এসে রহমান বললে কোয়াটারে গেছে।

হাতের মুঠোর মধ্যে রিভলবারটা শক্ত করে ধরে বিরিঞ্চি বললেন, অনাদি, তুমি ঘর পাহারা দাও। আমি একবার গিরিধারীর সঙ্গে মোলাকাতটা করে আসি।

অনাদি বিহ্বল চোখে তাকিয়ে রইল, কোনও জবাব দিলে না। তিনজনে প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে গিরিধারীর কোয়াটারের দিকে চলল। বিরিঞ্চি আগে আগে। প্রখর সূর্যের আলোয় জ্বলতে লাগল তার খাড়া চোয়াল আর আগুনের মতো চোখ। হাতের মুঠোর মধ্যে রিভলবারের কুঁদোটা ক্রমেই গরম হয়ে উঠতে লাগল। আর গণেশবাবুর মনে হতে লাগল, তাঁর চারপাশে একখানা অলক্ষ্য কালো হাত ঘুরে বেড়াচ্ছে—যখন-তখন সে তার ভয়ঙ্কর থাবাটা কাঁক করে তাঁর গলায় বসিয়ে দিতে পারে। হৃৎপিণ্ডের ভেতর তখন থেকে ধড়াস ধড়াস করছে, আচমকা হার্টফেল করে বসবেন না তো গণেশবাবু?

একটা ছোট তামাকের খেত পেরিয়ে গিরিধারীর কোয়াটার। সামনে খুঁটোয় বাঁধা একটা গরু জাবনা চিবোচ্ছে। জনমানুষ কোথাও নেই।

—গিরিধারী, গিরিধারী! কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। অসহিষ্ণু হয়ে গণেশবাবু দরজায় ধাক্কা দিলেন: এই ব্যাটা, করছিস কী? মরে আছিস নাকি ঘরের ভেতরে?

গণেশবাবুর ধাক্কার সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলে দু-ফাঁক হয়ে গেল। আর পরক্ষণেই সকলের চোখে পড়ল—

একটা দড়ির খাটিয়ার ওপরে একজন লোক পড়ে আছে। তার হাত-মুখ শক্ত করে কাপড় দিয়ে বাঁধা, চোখ দুটো অস্বাভাবিক বিস্ফারিত। আর তার বাঁধা মুখের ভেতর থেকে গোঁ-গোঁ করে একটা যন্ত্রণার চাপা শব্দ বেরিয়ে আসছে।

পাঁচ

গিরিধারী যা বললে তা অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার।

আপ আর ডাউন গাড়ি ক্রসিং হওয়ার পরে সে কোয়াটারে ফিরে আসে। ভারি খিদে পেয়েছিল তার। সকালে রান্না করে রেখে গিয়েছিল, ভেবেছিল ফিরে গিয়ে নিশ্চিন্তে খাবারটা খেয়ে নেবে। কিন্তু দু-গ্রাস ভাত মুখে দিতেই তার কী যে হল সে জানে না। হঠাৎ মাথাটা বোঁ করে ঘুরে উঠল, তারপর সব অন্ধকার। যখন জ্ঞান হল সে দেখলে, এই খাটিয়াটার সঙ্গে কে তাকে শক্ত করে বেঁধে রেখে গেছে। তার গায়ে যে কোম্পানির পোশাক ছিল, তাও উধাও।

—আমি পুলিশের লোক। আমার কাছে সত্য কথা বলবে। তা হলে বেলা বারোটার সময় তুমি প্ল্যাটফর্ম ঝাঁট দিচ্ছিলে ন ?

—না হুজুর।

—হঠাৎ একটা হাসির শব্দ তুমি শুনতে পাওনি?

—না হুজুর।

—হুঁ –বিরিঞ্চি আর কথা বাড়াল না। গণেশবাবুকে বললে, চলুন—হয়েছে ।

গণেশবাবু যেমন ভীত, তেমনি আকুল হয়ে উঠেছিলেন। হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কী স্যার? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!

—বোঝবার দরকার নেই—বিরিঞ্চি যেন তীব্রভাবে একটা ধমক দিলে: আপনি শুধু মুখ বুজে চুপ করে থাকুন। অনেক রহস্য আছে এর ভেতরে। যদি কোনও কথাবার্তা বলেন, তা হলে কিন্তু সব মাটি হয়ে যাবে —বুঝেছেন?

—আজ্ঞে হাঁ—শুকনো ঠোঁটটা চেটে গণেশবাবু জবাব দিলেন ; আমি কোনও বিপদে পড়ব না তো?

—বলা যায় না। তবে, আপনি চুপ করে থাকলে সেটাই নিরাপদ হবে।

—অ্যাঁ—বলা যায় না। গণেশবাবুর বুকের ভিতরটা ডাঙায় তোলা মাছের মতো ধড়ফড় করে খাবি খেতে লাগল। মনের সামনে এখনও ভাসছে অন্ধকার রাত্রিটার ছবি, দরজার হাতলের ওপরে একখানা ভয়ঙ্কর কালো হাত। তারপর মড়ার মাথা, বিরিঞ্চির পিস্তলের শব্দ আর গিরিধারীর দুর্গতি—সব মিলে কী-যে একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটতে যাচ্ছে, গণেশবাবু তা কল্পনাই করতে পারলেন না।

উঃ, হতভাগা গোমেজ! কী কুক্ষণেই ভাদুড়ীমশায়ের আমের ওপর তাঁর নজর পড়েছিল। এখন তার ঠালা সামলাতে প্রাণ যায় ! নাঃ—চাকরি ছেড়ে দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরেই ফিরে যাবেন তিনি। প্রাণ আগে, না চাকরি আগে?

বিরিঞ্চির মাথার ভেতর তখন ধু-ধু করে আগুন জ্বলছে। সেও কিছু বুঝতে পারছে না। এ কী করে হল —এ কেমন করে সম্ভব! নিজের চোখে সে দেখেছে মেঝের উপর উবুড় হয়ে পড়ে আছে শ্ৰীমন্ত রায়। রক্তে ভেসে যাচ্ছে । নিখুঁতভাবে ছোরার ঘা-টা যে তার বুকে লেগেছিল তাতেও সন্দেহ নেই। তবে?

তবে? বিরিঞ্চি মুঠোর মধ্যে শক্ত করে রিভলবারটা চেপে ধরল; তবে এ কী ব্যাপার? অনাদিকে আশ্বাস দিয়েছে বটে, কিন্তু ও-হাসি যে শ্ৰীমন্ত রায়ের, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। হ্যাঁ—নিঃসন্দেহে শ্ৰীমন্ত রায়। কিন্তু শ্ৰীমন্ত রায় কেমন করে আসবে এখানে? তা হলে এটা কি কোনও ভৌতিক ব্যাপার? একটা অশরীরী আত্মা?—গায়ের ভেতর শির-শির করে শিউরে গেল।

কিন্তু না—নিজেকেই একটা ধমক দিলে বিরিঞ্চি। ভূত-টুত ওসব নিতান্ত গাঁজাখুরি—ছেলে-ভোলানো

ব্যাপার। ভূতে বিশ্বাস করে না বিরিঞ্চি। তাছাড়া এ তো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, গিরিধারীকে খাটিয়ার সঙ্গে বেঁধে রেখে একটা লোক গিরিধারী সেজে তাদের ওপর বেশ এক চাল চেলে গেল, এবং সে-লোক যে শ্ৰীমন্ত রায়, এ-কথা বিরিঞ্চি কাগজে-কলমে লিখে দিতে পারে।

অতএব আর দেরি করা চলবে না। যা করবার আজকের রাত্রের মধ্যেই তা শেষ করে ফেলতে হবে। বেশ বোঝা যাচ্ছে, শিকার নিতাই সরকার। আর শিকারি দুজন—বিরিঞ্চি আর শ্রীমন্ত রায়। দেখা যাক—কে জেতে।

মুখের ভেতরে দাঁতগুলো কড়মড় করে উঠল বিরিঞ্চির। দুটো চোখ আগুনের দুটো গোলার মতো ধকধক করে জ্বলতে লাগল।

রাত অন্ধকার।

আকাশে মেঘ জমে আছে, তার তলায় ডুব দিয়ে তারাগুলো মিলিয়ে গেছে দৃষ্টির বাইরে। স্টেশনের আলোটা মিটমিট করে জ্বলছে, কিন্তু তাতে দুহাত দূরের অন্ধকারও আলো হয়ে উঠছে না। আর ওপারের ঢালু বিলের বুক থেকে তেমনি শন-শন হাওয়া দিচ্ছে। সমস্ত পরিবেশটাই যেন কেমন অস্বস্তিকর আর অস্বাভাবিক।

একটু পরেই মেল ট্রেন আসবে। আশেপাশে দু-তিনটে পোস্ট-অফিস থেকে কতগুলো মেল-ব্যাগ এসে জমে আছে—সেগুলো তুলে দিয়ে নতুন ব্যাগ নামাতে হবে । রাতে আর রানার যাবে না, সেগুলো জমা থাকবে স্টেশনে—তারপর সকালে—

রহমান খেতে গেছে, বাইরে বসে আছে গিরিধারী! ঠিক কালকের রাতটার মতো। গণেশবাবু ভাবছিলেন, এই শান্ত নিবিরোধ স্টেশনটায় এই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কত কী ঘটে গেল! কালো হাত থেকে আরম্ভ করে গিরিধারীর এই দুৰ্গতি পর্যন্ত সবই একটা রহস্যের সূত্রে গাঁথা। গণেশবাবুর ভয় করছিল, কিন্তু সেইসঙ্গে এও মনে হচ্ছিল যে এর ভেতরে নিশ্চয় কোনও লোকের শয়তানি আছে।

বিশেষ করে বিরিঞ্চি আর অনাদিকে তাঁর এতটুকু ভালো লাগছে না। বললে, ওরা নাকি আই-বির লোক। কিন্তু ভাব-ভঙ্গি দেখে গণেশবাবুর কেমন সন্দেহ জাগছে। ওদের ভঙ্গি ঠিক ভালো লোকের মতো নয়—কেমন যেন—

গণেশবাবু থানায় খবর পাঠাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিরিঞ্চি তা হতে দেয়নি। বলছে যে, তাতে নাকি কাজের ক্ষতি হবে। কিন্তু পুলিশের লোকের কাজের কী ক্ষতি হবে তা গণেশবাবু বুঝতে পারলেন না। নাঃ—তিনি টেলিফোন করে সদর স্টেশনে খবর দেবেন, সেখান থেকে তারা যা খুশি করুক। শেষে একটা অঘটন ঘটলে তাঁর কাঁধের ওপর যে সমস্ত দায়িত্বটা এসে খাঁড়ার মতো নেমে পড়বে তা তিনি কিছুতেই হতে দেবেন না। গোমেজের পাল্লায় পড়ে তাঁর সে-শিক্ষা হয়ে গেছে।

ঢং করে সাড়ে নটা বাজল। আর সঙ্গে সঙ্গেই ওদিকে ঝন-ঝন করে সাড়া উঠল টেলিফোন থেকে। নটা চল্লিশে ডাক-গাড়ি আসবে, তারই সূচনা।

স্টেশনে যাত্রী বেশি নেই—যে-দু-চারজন আছে, তাদের আগেই টিকিট দেওয়া হয়ে গেছে। টেলিফোন ধরে খানিকক্ষণ সাঙ্কেতিক ভাষায় আলাপ করলেন গণেশবাবু। তারপর বললেন, ঘন্টি লাগা গিরিধারী—সিগন্যাল দে। গাড়ি আসছে।

ঠিক আছে হুজুর—হাতের লাল-নীল লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে গিরিধারী সিগন্যাল দিতে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই অন্ধকারের ভেতর থেকে উড়ে এল আলোকের ঝড় । ডাক-গাড়ি এসে দু মিনিটের জন্যে দম নিলে মানিকপুরে। খানিকক্ষণ হইচই যাত্রীদের ওঠা-নামা। এর মধ্যেই মেল-ব্যাগ নামানো হয়ে গেল।

স্টেশন যখন আবার নিঃসাড় আর নিঝুম হয়ে গেল, তখন রাত দশটা। সাড়ে দশটা থেকে রহমানের ডিউটি। এই আধঘণ্টা সময়টুকু ভালোয় ভালোয় কেটে গেলে হয়। মেলব্যাগগুলো ছোট একটা ঘরের

ভেতর বন্ধ করে ভালো করে তালা-চাবি দিয়ে গণেশবাবু চেয়ারে এসে বসলেন, তারপর বিড়ি ধরালেন একটা।

হঠাৎ মনে পড়ল, এখানকার ব্যাপারটা সদরে জানানো দরকার।

গণেশবাবু টেলিফোনটা তুলে নিলেন। আর সেই মুহূর্তেই পিস্তলের শব্দে স্টেশনটা থরথর করে কেঁপে উঠল। গণেশবাবুর কাঁপা হাত থেকে রিসিভারটা ঠক করে টেবিলের ওপর পড়ে গেল।

টলতে টলতে ঘরের মধ্যে চলে এল গিরিধারী। ঘরের বড় আলোটায় গণেশবাবু যা দেখলেন তাতে তাঁর দম আটকে আসবার উপক্রম করল। গিরিধারীর বুকের বাঁ পাশ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে, তার নীল উর্দি লাল হয়ে গেছে রক্তে। এক হাতে ক্ষত-চিহ্নটাকে চেপে ধরে গিরিধারী মেঝের ওপরে পড়ে গেল।

অমানুষিক ভয়ে গণেশবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, গিরিধারী, এ কী ! কিন্তু তাঁর কথাটাও শেষ হতে পেল না।

খোলা দরজার পথে দুটি মূর্তি এসে দেখা দিয়েছে। দুটি মূর্তি—পিশাচের মতো জ্বলছে তাদের চোখ। তাদের দুহাতে দুটি পিস্তল গণেশবাবুর বুক লক্ষ্য করে উদ্যত হয়ে আছে, যেন এই মুহূর্তে তাঁকে গুলি করবে।

আর্তনাদ করে গণেশবাবু বললেন, বিরিঞ্চিবাবু, অনাদিবাবু! আপনারাই শেষে গিরিধারীকে—

—হ্যাঁ, আমরাই গিরিধারীকে খুন করেছি, দরকার হলে আপনাকেও খুন করব। —বাঘের মতো চাপা গলায় হিংস্র গর্জন করে বিরিঞ্চি জবাব দিলে।

গণেশবাবুর মুখ দিয়ে অব্যক্তভাবে বেরুল ; কেন? —চুপ, কোনও কথা নয়। তোমাকে মেরে আমাদের লাভ নেই। তোমরা দুজন ছিলে—আমাদের কাজের অসুবিধে হতে পারত, তাই একটাকে নিকেশ করে দিয়েছি।

দুটো উদ্যত রিভলবারের মুখে দাঁড়িয়ে ঘামে গণেশবাবুর সবাঙ্গ ভিজে যেতে লাগল। বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ড যেন পাথর হয়ে গেছে তাঁর।

—চাবি দাও শিগগির—অনাদি পাগলা শেয়ালের মতো খেকিয়ে উঠল।

—কিসের চাবি—

—যে-ঘরে ডাকের ব্যাগ রেখেছ সেই ঘরের।

গণেশবাবুর কথা কইবার শক্তি যেন লোপ পেয়েছে। তিনি শুধু নিঃশব্দে আঙুল বাড়িয়ে টেবিলের ওপরকার চাবির গোছাটা দেখিয়ে দিলেন।

অনাদির পিস্তলটা তেমনি গণেশবাবুর দিকে মুখ করে আছে, বিরিঞ্চি একটা থাবা দিয়ে চাবিগুলো তুলে নিলে। আতঙ্ক-বিহ্বল আচ্ছন্ন দৃষ্টির সাহায্যে গণেশবাবু স্পষ্টই দেখতে পেলেন, বুনো জানোয়ারের ক্ষুধিত মুখের মতো একটা উগ্র লোভ বিরিঞ্চি আর অনাদির চোখে-মুখে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে ।

—কোন চাবি? শিগগির বলে দাও—আমাদের সময় নেই।

—ওই তো বড় পিতলেরটা।

এইবার হঠাৎ পিশাচের মতো হেসে উঠল বিরিঞ্চি। সেই হাসিতে অনাদিও যোগ দিলে—পাগলা শেয়ালের গোঙানির মতো সে টেনে টেনে হাসতে লাগল। বিরিঞ্চি বললে, শোনো গোবর-গণেশ, তোমাকে আমরা খুন করব।

—কেন? গণেশবাবু শেষ চেষ্টায় নিজেকে সংযত করলেন। বিপদের সময় অতি বড় কাপুরুষের বুকেও সাহস জেগে ওঠে, গণেশবাবুরও তাই হল।

গণেশবাবু বললেন, আমি চাবি তো দিয়েছি।

—কিন্তু তুমি আমাদের মুখ চেনো।

—সে তো রহমান চেনে, রাম সিংও চেনে।

—সকলকেই সাবাড় করব—এবং আজ রাত্রেই করব।

যেটুকু শক্তি মনের মধ্যে জেগে উঠেছিল, সেটুকু লোপ পেয়ে গেল নিঃশেষে। এরা খুনে, এরা ডাকাত! গণেশবাবু কেঁদে উঠলেন : টাকা নিয়ে যাও, আমাকে বাঁচাও! আবার অনাদি আর বিরিঞ্চি তেমনি অমানুষিকভাবে হাসতে শুরু করলে।

—বাঁচাতে পারতুম, কিন্তু উপায় নেই। তা হলে আমরাই বিপদে পড়ব।

—তোমরা আমাকে মারবেই?

—নিশ্চয়। রেডি হও। ইচ্ছে হলে শেষবারের মতো ভগবানকেও ডেকে নিতে পারো। গণেশবাবুর মনের সামনে ছবির মতো ভেসে গেল তাঁর কলকাতার বাড়ি। বুড়ি মা, স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে। তারা যখন এই খবর পাবে—

শেষ চেষ্টায় গণেশবাবু বললেন, আমাকে বাঁচাও !

অনাদির হাতের পিস্তলটা কাঁপতে লাগল ; অসম্ভব। ওয়ান—টু— গণেশবাবু চোখ বুজলেন। কিন্তু অনাদি থ্রি বলবার আগেই জানলা-পথে একটা বিদ্যুতের ঝলক। গুড়ুম করে পিস্তলের শব্দ—যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে অনাদি বসে পড়ল। তারপর আরও শব্দ-আরও, আরও। ঝনঝন করে ঘরের আলোটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, একটা সীমাহীন অন্ধকারে প্লাবিত হয়ে গেল সমস্ত। বাইরে থেকে উৎকট হাসির তরঙ্গ উঠল : হাঃ—হাঃ—হঃ—হাঃ–

অন্তিম চেষ্টায় প্রবল একটা চিৎকার করে গিরিধারীর রক্তাক্ত মৃতদেহের ওপরে গণেশবাবু মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

ছয়

বুকের ওপর গেঞ্জিটার গায়ে রক্তমাখা একটা হাতের ছাপ জ্বলজ্বল করছে।

নিতাই সরকার পাথরের মূর্তির মতো বসে রইল খানিকক্ষণ। ভাববার বা কথা বলার শক্তি তার একেবারে লোপ পেয়ে গেছে। মাথার ভেতরে কী একটা চাকার মতো ঘুরছে প্রচণ্ড বেগে, কানের কাছে ভোমরার ডাকের মতো নিরবচ্ছিন্নভাবে বোঁ-বোঁ করে শব্দ হচ্ছে। বাইরে বাতাসের গোঙানি চলেছে অশ্রান্তভাবে—যেন অশরীরী শ্ৰীমন্ত রায় আহত হয়ে আর্তনাদ করে উঠেছে। ঘরের ভেতরে ছোট আলোটা জ্বলছে, কোনও ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ একচক্ষু দানবের চোখ থেকে যেন হিংসার আগুন পিছলে পড়ছে।

কতক্ষণ কেটে গেছে নিতাইয়ের খেয়াল ছিল না । হঠাৎ একসময় সচেতন হয়ে সে আর্তনাদ করে উঠতে চাইল। কিন্তু গলা দিয়ে স্বর ফুটল না—কে যেন তার জিভটাকে গলার ভিতর দিয়ে একেবারে সোজা পেটের মাঝখানে টেনে নিয়ে গেছে।

শ্ৰীমন্ত রায় ! শ্ৰীমন্ত রায় সত্যিই মরেনি ! না—না, তা কী করে সম্ভব। তার হাতের ছোরা তো ব্যর্থ হয়নি। মনে পড়ছে কাশী মিত্র ঘাটের পাশে সেই নির্জন গলি আর শূন্য পাটগুদাম। বাইরে ঝাঁ-ঝাঁ রাত। স্ট্র্যান্ড রোড ঘুমিয়ে পড়েছে, গঙ্গার বুক থেকে কোনও শব্দ শোনা যাচ্ছে না—শুধু দূর থেকে ভেসে আসছে একটা মাতালের চিৎকার আর মাঝে মাঝে কুকুরের ডাক। একটা পেটা ঘড়িতে রাত দুটো বাজল।

শূন্য পাটগুদামের নির্জন তেতলা। বিদ্যুতের বাতি নেই, শুধু একটা লণ্ঠন মিটমিট করছিল। ঘরে ছিল তারা দুজন। কেশবদাস মাগনিরামের গদি থেকে লুট করে আনা পনেরো হাজার টাকার নোটের তাড়াটা তাদের সামনেই পড়েছিল। আধাআধি ভাগ হবে। দু'জনের চোখই লোভে জানোয়ারের মতো জ্বলছিল।

হঠাৎ নিতাই বলেছিল, ওই জানলাটা বন্ধ করে দাও ভাই শ্ৰীমন্ত। এত রাত্রে এখানে আলো দেখে কোনও ব্যাটা পুলিশ যদি—

—ঠিক কথা।

—শ্ৰীমন্ত উঠে পড়েছিল, বন্ধ করতে গিয়েছিল জানলা । আর এই মুহূর্তের জন্যেই অপেক্ষা করছিল নিতাই। বিদ্যুৎবেগে উঠে দাঁড়িয়ে সে টেনে বার করেছিল একখানা ধারালো ছোরা, লণ্ঠনের আলোয় সেটা ক্ষুধার্ত বাঘের জিভের মতো লকলক করে উঠেছিল। শ্ৰীমন্ত তখনও পেছন ফিরে আছে, ঘাসের ভেতরে লুকিয়ে-থাকা বিষধর গোখরো সাপের মতো যে বিপদ তার দিকে এগিয়ে আসছে তা কল্পনাও করতে পারেনি। চোখের পলকে নিতাই হাতখানাকে ওপরে তুলেছিল, বাঘের জিভটায় লেগেছিল একটা তীব্র ঝলক, তারপরেই সেটা সবেগে গিয়ে বিঁধেছিল শ্ৰীমন্ত রায়ের পিঠে।

—বিশ্বাসঘাতক—

কথাটা সম্পূর্ণও বেরুতে পারেনি শ্ৰীমন্ত রায়ের মুখ দিয়ে। টলতে টলতে সে মাটিতে উবুড় হয়ে পড়ে গিয়েছিল, ফোয়ারার মতো খানিক রক্ত উছলে এসে নিতাইয়ের জামায় ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু নিতাই আর এক মুহূর্ত দেরি করেনি। বিদ্যুতের মতো নোটের তাড়াটা পকেটে পুরে নিয়ে এবং ঘরের আলোটা নিবিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে দরজায় শিকল বন্ধ করে দিয়েছিল ; পথে বেরিয়ে এসে সোজা গঙ্গার ঘাটে গিয়ে গায়ের রক্তাক্ত জামাটা ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল গঙ্গার খরধারার মধ্যে। তারপর—

তারপর আজ সেই শ্ৰীমন্ত রায় ফিরে এসেছে !

অশরীরী। ভূত! কে জানে? নিতাই কিছু ভাবতেও পারছে না, বুঝতেও পারছে না। ছয় মাস আগে এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল, যার পর থেকে সে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে মরবার পরেই শ্ৰীমন্ত রায় ফুরিয়ে যায়নি। দেহীই হোক আর অশরীরীই হোক, সে যে নিতাইকে খুঁজে বেড়াচ্ছে এ নিঃসন্দেহে সত্য, এবং একদিন সে যে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবে, তাতেও কোনও সংশয় তার নেই।

হাঁ—এক বছর আগেকার ঘটনা। পটলডাঙার এক মেসবাড়িতে সে তখন আস্তানা নিয়েছিল। হঠাৎ নিশিরাতে ঘুম ভেঙে গিয়ে খোলা জানলায় তার চোখ পড়েছিল। রাস্তা থেকে অল্প অল্প গ্যাসের আলো আসছিল, সেই আলোয় দেখেছিল, ছায়ামূর্তির মতো একজন মানুষ ওখানে দাঁড়িয়ে। .

আর এক লহমায় সে মানুষটাকে চিনতে পেরেছিল—আবছা আলোতে তার ভুল হয়নি একবিন্দু। সে আর কেউ নয়—শ্বীমন্ত রায়। নিজের চোখ দুটোকে ভালো করে বিশ্বাস করবার আগেই মূর্তিটা মিলিয়ে গিয়েছিল হাওয়ায়—মিলিয়ে গিয়েছিল ব্ল্যাকআউটের কলকাতার রহস্যময় অন্ধকারে।

সেই থেকে একটা আশ্চর্য ভয় সঞ্চারিত হয়ে গেছে নিতাইয়ের চেতনায়। ভূতের ভয়, অশরীরীর ভয়। তারপরেই নিতাই কলকাতা ছেড়ে চলে এসেছিল। রাত্রির অন্ধকার এলেই তার শরীর ছমছম করে উঠত, থমথম করে উঠত মন। মাঝে মাঝে আশঙ্কা হত, গভীর রাত্রে তার ঘরের চারপাশে যেন শিকারি বিড়ালের মতো পা ফেলে শ্বীমন্ত রায় চলে বেড়াচ্ছে। তার সবাঙ্গ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে, তার চোখে দপদপ করে জ্বলছে প্রতিহিংসার আগুন।

অবশেষে বিভীষিকা কিনা সত্যি-সত্যিই এসে দেখা দিল। বাইরে বাতাস গোঙাচ্ছে—অন্ধকার আমবাগান যেন আছাড়ি-পিছড়ি করছে একটা প্রবল আক্রোশে। হঠাৎ ধড়াস করে একটা শব্দ হয়ে পেছনের জানলাটা খুলে গেল, ঘরের ভেতর ঢুকল একটা মাতাল বাতাস, আর—

আর সমস্ত ঘরটার মধ্যে ধুলোর ঘূর্ণির একটা পাক দিয়ে সেই বাতাস দপ করে আলোটাকে নিবিয়ে দিলে। মনে হল খোলা জানলার পথে শ্বীমন্ত রায় আবার এসে ঘরে ঢুকেছে ।

এতক্ষণে—এইবার ঘর-ফাটানো আর্ত একটা চিৎকার বেরুল নিতাইয়ের গলা দিয়ে। মুহূর্তে সমস্ত বাড়ি জেগে উঠল, হইচই করে লোক ছুটে এল।

পরের দিনটা তার কী ভাবে যে কাটল সে-কথা ভগবানই বলতে পারেন। গত রাত্রিতে এ কী ঘটল? এমন দুঃস্বপ্ন যে কখনও সম্ভব হতে পারে এ-কথা কি সে কোনওদিন কল্পনাই করতে পেরেছিল নাকি? কিন্তু তবুও তো এ সম্ভব হল। স্বপ্ন মনে করে একে উড়িয়ে দেওয়া চলবে না, বুকের ওপরে হাতের লাল ছাপখানাই তার প্রমাণ।

কী করবে সে? কী উপায় তার? পালিয়ে যাবে? কিন্তু পালিয়েই বা লাভ কী? যার দেহ আছে তাকে ফাঁকি দেওয়া চলে, কিন্তু অশরীরীর দৃষ্টিকে অতিক্রম করবার কোনও উপায় নেই। যেখানেই যাও—ঠিক তোমাকে খুঁজে বার করবে, প্রতিশোধ নেবে। আকাশে-বাতাসে প্রেতাত্মার আগুন-ভরা রাশি-রাশি চোখ ভেসে বেড়াচ্ছে । অন্ধকারের আড়ালে আড়ালে ঘুরছে তার হিংস্র থাবা, তার রক্তাক্ত নখর।

সমস্ত দিন সে অসুস্থের মতো ঘরের মধ্যে পড়ে রইল। কানের কাছে ক্রমাগত বাজছে রাত্রির সেই ভবিষ্যদ্বাণী—তিনদিন মাত্র সময়। তার একটা দিন তো কেটে গেল। তারপর আর একদিন কাটবে, তারপরে আরও একটা দিন। নিতাই কিছুই করতে পারে না। কোনও প্রতিকার করতে পারে না, শুধু একান্ত অসহায়ভাবে, একান্ত মূঢ়ের মতো একটা ভয়ঙ্কর বীভৎস পরিণামের জন্যে প্রতীক্ষা করে থাকবে।

উঃ, অসহ্য। নিতাই যেন পাগল হয়ে যাবে। মাথার ভেতরে তার আগুনের একটা কুণ্ড যেন খাঁ-খাঁ করে জ্বলছে। অন্যায় করেছিল সে—এই তার শাস্তি। অন্যায় কখনও ঢাকা থাকবে না, পাপ কখনও চাপা থাকবে না। অনেক টাকার মালিক হয়েছে সে—বড়লোক হয়েছে। কিন্তু শান্তি কই? সুখ কোথায়? শুধু এক শ্বীমন্ত রায়কেই তো ছোরা মারেনি। যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে সে ধানচালের ব্লাক-মার্কেট করেছে। শুধু এক শ্বীমন্ত রায়ই নয়—দুর্ভিক্ষে যারা অনাহারে মরেছে, তারা সবাই কি এই সুযোগে তার ওপরে প্রতিশোধ নিতে আসবে?

মর্মান্তিক যন্ত্রণায় আর-একটা দিন কেটে গেল। এইবারে ট্রেনের একখানা টিকিট কিনে সে দিল্লি-আগ্রা কোথাও চম্পট দেবে কি না ভাবছে, এমন সময় দারোগা সাহেব এসে উপস্থিত।

এত বন্ধুত্ব, এত খাতির, তবু নিতাইয়ের বুকটা হঠাৎ ধড়ফড় করে উঠল। আচমকা মনে হল, যেন সে যে শ্বীমন্ত রায়কে খুন করেছে এ-খবরটা জানাজানি হয়ে গেছে পৃথিবীর সব জায়গায়। আর সেই অপরাধে

দারোগাসাহেব তাকে গ্রেপ্তার করতে এসেছেন।

নিতাই চমকে উঠে দাঁড়াল। হাত থেকে হুকোটা ঠকাস করে পড়ে গেল মাটিতে। দারোগা হো-হো করে হেসে উঠলেন।

—তোমার হল কী সরকার? এমন আঁতকে উঠলে কেন?

নিজেকে সামলে নিয়ে নিতাই বললে, না, কিছু হয়নি তো?

—তবে অমন ভয় পেলে কেন?

—না—না—ভয় পাইনি। কিন্তু এই সাত-সকালে আমন ধড়াচুড়ো পরে কোথায় চললেন দারোগাসাহেব!

—শোনোনি কিছু? মানিকপুর স্টেশনে কাল রাত্রে ভয়ঙ্কর কাণ্ড হয়ে গেছে যে।

নিতাইয়ের মাথার মধ্যে রক্ত চলকে গেল। —কী হয়েছে মানিকপুরে?

—খুন! পয়েন্টসম্যানকে খুন করে দুজন ভদ্র ডাকাত স্টেশনের মেল-ব্যাগ লুট করতে চেয়েছিল। স্টেশনমাস্টার গণেশবাবুকেও তারা খুন করতে যাচ্ছিল—এমন সময় বাইরে থেকে কে পিস্তলের গুলি ছুড়ে একজন ডাকাতকে আহত করে। ডাকাত দুটো পালিয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য, যে গুলি ছুড়ে ডাকাত তাড়াল, তার কোনও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

—কী ভয়ানক!

—হ্যাঁ, ভয়ানক ব্যাপার বইকি! শুনে তো আমারই হাত-পা পেটের ভেতরে সেধিয়ে যাচ্ছ! আছি বাবা ধ্যাধ্যেড়ে গোবিন্দপুরের এক জঙ্গলের ভেতর পড়ে, এখানে ও-সব বোমা-পিস্তলের কারবার কেন? সিধে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করুক, লাঠিপেটা করে দু-একটার মাথা ভাঙুক, গ্রামকে গ্রাম ধরে চালান করে দিই সদরে। কিন্তু এ সব কী রে বাপু!

পিস্তল। ভদ্র ডাকাত –নিতাইয়ের সমস্ত মুখটা ছাইয়ের মতো বিবর্ণ হয়ে গেল। এই ঘটনাটা যেন বিচ্ছিন্ন একটা আকস্মিক ব্যাপার নয়। আচমকা তার মনে হল, যেন এর সঙ্গে কোন একটা অলক্ষ্য সূত্রে তার ভাগ্যটাও জড়িয়ে আছে।

দারোগা বললেন, আরে সেই তো বলছি। এর ভেতরে মস্ত একটা রহস্য আছে, বিস্তর ঘোরপাঁচ আছে। এ-নিয়ে ধস্তাধস্তি করা আমাদের মতো পুঁটিমাছ দারোগার কম্ম নয় বাবা। সিঁধেল চোর দু-চারটে ধরতে পারি, দাগিকে এনে ঠাঙানি লাগাতে পারি ; অর্থাৎ সেরেফ খাই-দাই আর কাঁসি বাজাই। জয়ঢাক বাজাতে হলে কেমন করে ঠালা সামলাই!

হঠাৎ নিতাই চুপ করে রইল। একটা বিড়ি ধরিয়ে দারোগা বললেন, যাচ্ছি তো এনকোয়ারিতে। ওখান থেকে সোজা সদরে চিঠি লিখ ; দু-চারটে ডিটেকটিভ-ফিভ পাঠিয়ে দাও। এ-সব ভদ্র ডাকাতের ব্যাপারে ইয়াসিন মিঞা নেই। শেষকালে রাত-বেরেতে দু-চারটে পিস্তলের গুলি মেরে দিলে কোন আফজুদ্দিন চাচা আমাকে বাঁচাতে আসবে।

ঘোড়া ছুড়িয়ে দারোগা চলে গেলেন। যাবার আগে বলে গেলেন, তুমিও সাবধান হয়ে থেকে সরকার—লক্ষণ আমার ভাল ঠেকছে না।

—অ্যাঁ—অ্যাঁ—আমি! আমি কেন?

দারোদা ঘোড়া থামালেন। ভয়ানক একটা গুরুগম্ভীর চেহারা করে তাকালেন নিতাইয়ের দিকে।

—বিশ্বাস কী! তুমি তো অনেক টাকা করেছ—বাজারে জোর গুজব। ভদ্র ডাকাতেরা একবার তোমার ঘরে যদি হানা দেবার চেষ্টা করে তাতে অন্যায়টা কোথায় আছে!

নিতাইয়ের পিলে-যকৃতে ভূমিকম্প জাগিয়ে হিতৈষী ইয়াসিন দারোগ প্রস্থান করলেন। নিতাই সরকার উঠে দাঁড়াল। কী করবে কিছু বুঝতে পারছে না। হাতে আর একদিন মাত্র সময়। অশরীরী শ্বীমন্ত রায়ের

আগুন-ভরা চোখ থেকে কোনওখানে সে নিস্তার পাবে না। বুকের গেঞ্জিতে রক্তরাঙা হাতের ছাপ তার ভয়ঙ্কর পরোয়ানা জানিয়ে গেছে।

—রাধেকৃষ্ণ—

নিতাই চমকে উঠল। সামনে একজন বুড়ো বৈরাগী এসে দাঁড়িয়েছে। একটা গোপীযন্ত্র বাজাচ্ছে টুং টুং করে। বলছে ; হরেকৃষ্ণ—দুটি ভিক্ষে পাই?

নিতাইয়ের সমস্ত রাগ নিরীহ বৈরাগীটার ওপরে গিয়েই ফেটে পড়ল। জানোয়ারের মতো দাঁত খিচিয়ে বললে, হ্যা-র কৃষ্ণ ! ভিক্ষে করতে এসেছে ! যাও, ভাগো এখান থেকে! বোষ্টম না আরও কিছু, যত শালা জোচ্চোর!

—তোমার এত টাকা, গরিব বোষ্টমকে তাড়িয়ে দিচ্ছ বাবা?

—আমার এত টাকা! কে তোমাকে খবরটা দিলে হ্যা? ইয়ার্কি পেয়েছ, মামাবাড়ির আবদার, না? যাও, নিকালো হিয়াসে —রাগের চোটে নিতাইয়ের মুখ দিয়ে হিন্দী বেরুতে লাগল ; নেহি যায়গা তো এক ঘুষি দেকে মুণ্ডু উড়ায়ে দেগা!

পাকা দাড়ির আড়ালে বুড়ো বৈরাগীর চোখ একবার ধক করে জ্বলে উঠেই নিবে গেল। বৈরাগী বললে, আচ্ছা বাবা চলে যাচ্ছি, বুড়ো মানুষকে ঘুষি মেরে তোমার আর বীরত্ব দেখাতে হবে না। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। হরেকৃষ্ণ !

টুং টুং করে গোপীযন্ত্র বাজিয়ে বৈরাগী দ্রুতপদে অগ্রসর হয়ে গেল। আর বৈরাগী চলে যাওয়ার পরেই একটা আশ্চর্য ব্যাপার চোখে পড়ল নিতাইয়ের। সামনে ঘাসের ওপরে একখানা নীল রঙের খাম পড়ে আছে।

ক্ষিপ্ব হাতে খামটা তুলে নিতেই তার ভেতর থেকে একটুকরো চিঠি বেরিয়ে পড়ল। রুদ্ধশ্বাসে চিঠিটা পড়ে গেল নিতাই :

‘তোমার বিপদের কথা আমরা জানি। কোনও ভয় নাই। শ্বীমন্ত রায়ের প্রেতাত্মার হাত হইতে যদি রক্ষা পাইতে চাহ, তাহা হইলে এই চিঠির আদেশ পালন করিও। আজ সন্ধ্যার পরে নীলকুঠির জঙ্গলে আসিও—একা। কোনও ভয় করিও না—তোমার সমস্ত বিপদের যাহাতে অবসান হয় সেই পথ তোমাকে বাতলাইয়া দিব। যদি অবহেলা করিয়া না আসো, তাহা হইলে জানিও যে ভয়ঙ্কর দুর্ভাগ্য তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তাহা হইতে কেহ তোমাকে রক্ষা করিতে পরিবে না । ইতি— তোমার বন্ধু।’

সাত

ব্যাপার দেখে ইয়াসিন দারোগা খানিকক্ষণ হাঁ করে রইলেন। খুনি আর দাগি নিয়ে কারবার করেছেন বিস্তর, কিন্তু এমন অভিজ্ঞতা জীবনে বিশেষ ঘটেনি। একে অজ পাড়া-গাঁ, এই ছোট স্টেশন—বিহারের একটা নিরিবিলি অঞ্চল। এখানেও যে এমন সব ঘটনা ঘটতে পারে, এ কি কল্পনাও করা যায় কখনও? জামার্ন-যুদ্ধের চাইতেও এ ভয়ানক—জাপানী বোমার চাইতেও এ যে মারাত্মক!

অফিস ঘরের মেঝেতে তেমনি পড়ে আছে গিরিধারীর লাশটা। গলা আর বুকের ভেতরে দিয়ে দু-দুটো পিস্তলের গুলি পরিষ্কারভাবে বেরিয়ে গিয়েছে। খুব কাছে থেকেই গুলি করা হয়েছিল। নীল উর্দি রক্তে একেবারে ভিজে গেছে। মেঝের ওপর দিয়ে অনেকটা গড়িয়ে গেছে রক্ত—শুকিয়ে গিয়ে সে-রক্ত আঠার মতো কালো হয়ে আছে। দেওয়ালের গায়েও সে-রক্তের ছিটে । গিরিধারীর পদা-পড়া নিষ্পলক হলদে চোখ দুটো তখনও ভয়ে আর বিস্ময়ে অস্বাভাবিকভাবে বিস্ফারিত হয়ে আছে, যেন ব্যাপারটা কী ঘটেছে ভাল করে বোঝবার আগেই মৃত্যু তার প্রেত-ছায়া ছড়িয়ে দিয়েছে তার চেতনার ওপরে।

একপাশে টেলিফোনের রিসিভারটা ঝুলে পড়েছে টেবিল থেকে নীচেতে। একটা গুলি তার মাউথপিসে লেগেছিল—খানিকটা উড়ে গেছে তার থেকে। শক্ত দেয়ালের গা থেকে খানিকটা চুন-সুরকি ঝরিয়ে দিয়ে একটা কালো বুলেট প্রায় এক ইঞ্চি ভেতরে ঠুকে শক্ত হয়ে আটকে বসেছে—যেন একটা বড় পেরেককে জোরে ঢুকে ওখানে বসিয়ে দিয়েছে কেউ । ঘরটার দিকে একবার তাকালেই বুঝতে পারা যায়, কাল রাত্রে কী ভয়ঙ্কর প্রলয় কাণ্ড ঘটে গিয়েছে ওখানে—বয়ে গেছে কী ভয়ঙ্কর একটা দুর্যোগ।

অনেকক্ষণ কোনও কথা বলতে পারলেন না ইয়াসিন দারোগা। সামনে গিরিধারীর দেহটা একটা পৈশাচিক বিভীষিকার মতো পড়ে রয়েছে। হঠাৎ চোখে পড়ল, দেওয়ালের কোণ ঘেঁষে ছোট গোলমতো কী একটা পড়ে আছে।

দারোগা লাফিয়ে উঠে ওটাকে তুলে আনলেন। একটা পিস্তলের খালি কার্তুজ। সেটাকে মন দিয়ে নাড়াচাড়া করে তিনি বললেন, হুঁ।

অর্থাৎ যেন মস্ত একটা সমস্যার সমাধান তিনি চোখের সামনে দেখতে পেয়েছেন। এর পরে চটপট আসামীদের ধরে ফেলতে তাঁর কোনও অসুবিধেই ঘটবে না।

খানিকটা ধাতস্থ হয়ে ইয়াসিন দারোগা একটা বিড়ি ধরালেন। আর যাই হোক, দিনের বেলা। চারিদিকে ঝকঝক করছে রোদ। স্টেশন ভরা লোক। একটা বিচিত্র ঘটনার গন্ধ পেয়ে আশপাশ থেকে কিছু কৌতুহলী লোকও এসে জড়ো হয়েছে। রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে তার অজানা ভয় আর আশ্চর্য বিভীষিকাটাও মিলিয়ে গিয়েছে। এখন কোনও আনাচ-কানাচ থেকে একটা বেখাপ্পা পিস্তলের গুলি এসে তাঁর টুপিটাকে উড়িয়ে দিতে পারবে না—এ-সম্পর্কে প্রায় নিশ্চিত আর নিশ্চিন্ত বোধ করলেন ইয়াসিন দারোগা। অতএব এবার নিশ্চিন্ত-চিত্তে কর্তব্য পালনে মনোযোগী হওয়া যায়। তাঁর মতো একটা ভারিক্কি দারোগার যে-রকম পদমর্যাদা থাকা উচিত, সেইরকম চোখমুখের একটা ভয়ঙ্কর ভঙ্গি করে তিনি বিড়ির ধোঁয়া ছাড়লেন। জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর—শহরে খবর দিয়েছেন নিশ্চয়?

একটা চেয়ারে বিহ্বলের মতো বসে ছিলেন গণেশবাবু। তাঁর কপালে একটি পটি বাঁধা, কেমন করে যেন কেটে রক্ত বেরিয়েছিল ওখান থেকে। অন্ধকার ঘরের ভেতর যে-সব ধস্তাধস্তি ঘটেছিল—তার ফলেই ওটা হয়ে থাকবে বোধহয়।

গণেশবাবু সেই রাত থেকে দারুভূত মুরারির মতো ঠায় বসে আছেন। ভয়ে-আতঙ্কে আর ঘটনার অস্বাভাবিক আকস্মিকতায় তাঁর কথাই বন্ধ হয়ে গেছে তখন থেকে। ইয়াসিন দারোগার কথায় শুধু তাঁর ঠোঁটটা একবার নড়ে উঠল। তিনি কী একটা বলবার চেষ্টা করলেন, বলতে পারলেন না।

জবাব দিলে এ-এস-এম রহমান।

—হাঁ স্যার, টেলিফোন করেছি।

—কোনও খবর এল?

—হ্যাঁ, খবর পাঠিয়েছে। বারোটার ট্রেনে লোক আসছে।

—যাক—বাঁচা গেল। ইয়াসিন দারোগা দায়মুক্ত। তবু যতটা পারা যায় নিজের কর্মদক্ষতার পরিচয়টা এই ফাঁকে দিয়ে দেওয়া দরকার।

—তা বেশ। ওরা এলে ভালোই হবে। কিন্তু এ সামান্য ব্যাপার—আমিই এর কিনারা করতে পারতাম। কত খুন-জখম জল করে ফেলল এই ইয়াসিন দারোগা—কত ফেরারীকে ধরে চালান করে দিলে, আর এ তো— হুঁ!—

গলার স্বরে উচ্ছসিত গর্ব্ব আর গৌরব ফুটে বেরুল ।

রহমান বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ-স্যার।

ইয়াসিন খুশি হয়ে গর্বভরে পা নাচাতে লাগলেন।

রহমান জিজ্ঞাসা করলে, ব্যাপারটা আপনার কী মনে হয় স্যার?

দারোগা অত্যন্ত বিচক্ষণের মতো একবার ডাইনে আর একবার বাঁয়ে হেলালেন ঘাড়টা। মুখের ওপর মুরুব্বিয়ানার একটা গুরু-গম্ভীর ছায়া পড়ল ; আমার তো মনে হয় এ একেবারে জলের মতো পরিষ্কার কেস। আসামীকে আমি চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি—ইচ্ছে করলেই অ্যারেস্ট করতে পারি। কিন্তু শহরের কর্তাদের কেরামতিই এবারে দেখা যাক । তারপরে যা করবার আমি করব।

—আচ্ছা স্যার—একবার কেশে নিয়ে রহমান জিজ্ঞাসা করলে ; দুজন লোক ডাকাতি করবার জন্যে এসেছিল এ তো বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু তাদের গুলি করে তাড়ালেই বা কে, আর অমন করে হাসলেই বা কেন? তা ছাড়া কালো হাতখানাই বা কার? আর তা ছাড়া ঘরের ভেতরে মড়ার মাথা গড়িয়ে দেওয়া—

ইয়াসিন দারোগা একেবারে দস্তুরমতো বিরক্ত হয়ে উঠলেন।

—আরে মশাই, আপনি তো আচ্ছা লোক? বলি, দারোগা কে? আপনি না আমি?

রহমান সঙ্কোচে এতটুকু হয়ে গেল : আজ্ঞে আপনি।

—তবে?

উত্তরে কী বলা যায় রহমান ভেবে পেল না।

—দারোগা না হলে কি বোঝা যায় মশাই? রেল-কোম্পানির ঘণ্টা বাজিয়ে আর মালগাড়ির হিসেব নিয়ে কি পুলিশের ব্যাপার বুঝতে পারা যায়? এর জন্যে আলাদা মগজ চাই—হুঁহুঁ। সরকার আমাদের মুখ দেখে বহাল করেনি, বুঝলেন? ভেতরে অনেক বস্তু আছে বলেই একটা থানার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা করে দিয়েছে। মানেন কি না?

—আজ্ঞে মানি বইকি!

—তা হলে? তা হলে এত সহজেই বুঝতে চাইছেন কেন সব? ধৈর্য ধরে থাকুন, সময়ে সব জানতে পারবেন।

ঘরের সবাই একেবারে চুপ মেরে রইল।

দারোগা একখানা খাতা বার করলেন। বললেন, এনকোয়ারি-রিপোর্টটা তৈরি করে ফেলা যাক। খুন-জখম, পিস্তলের কাণ্ড—গুরুতর ব্যাপার। আপনারা যে যা জানেন সব ঠিক করে বলবেন। যদি সত্যি কথা একবিন্দু গোপন করেন তা হলে সকলকে জেলে যেতে হবে—মনে থাকে যেন !

—আজ্ঞে মনে থাকবে বইকি।

মহা আড়ম্বরে দারোগা সাক্ষ্য নিতে বসলেন। এক ঘণ্টার মধ্যে তিনবার চা এল, দুটো ডাব এল। সেইসঙ্গে যেমন তর্জন, তেমনি গর্জন। ভাব দেখে মনে হল, হাতের কাছে আসামীকে না পেলে তিনি এঁদের ফাঁসিকাঠে নিয়েলটকে দেবেন। গণেশবাবু একেই হতভম্ব হয়ে বসে ছিলেন, দারোগার ধমক-ধামকে তাঁর প্রায় হার্টফেল করবার উপক্রম হল।

রিপোর্ট লেখা হল।

চতুর্থ পেয়ালা চা আর তিন নম্বর ডাব নিঃশেষ করে ইয়াসিন দারোগ উঠতে যাবেন, এমন সময় ঘরে ঢুকল স্টেশনের ঝাড়ুদার রামগিদ্ধড়। দারোগকে সেলাম দিয়ে বললে, হুজুর, আপকা চিঠঠি!

—আমার চিঠি? সবিস্ময়ে দারোগা বললেন, আমার চিঠি? কোত্থেকে এল?

—একঠো বাবু দিয়া। মাস্টারবাবু, আপকো ভি একঠো দিয়া।

—কোন বাবু?

—মালুম নেহি। একঠো গোরা বাবু, নয়া আদমি কোই হোগা।

কী ব্যাপার। কথা নেই বার্তা নেই, কোত্থেকে এক নতুন বাবু এসে স্টেশনমাস্টার আর দারোগাকে চিঠি দিয়ে গেল!

ক্ষিপ্রগতিতে খাম ছিঁড়তে ছিড়তে দারোগাবাবু বলল, কিধার হ্যায় বাবু?

—চলা গিয়া।

—বটে!

খাম খুলে দুজনেই চিঠি বার করলেন। তার চিঠি পড়বামাত্র দুজনেরই মুখের ভাব এক রকম হয়ে গেল—মড়ার মতো বিবর্ণ আর পাঙাশে।

দারোগার চিঠিতে লেখা ছিল সংক্ষেপে মাত্র এই কটি কথা :

‘বেশি চালিয়াতি না করে বাড়ি যাও—নইলে বেঘোরে মারা পড়বে। —হিতৈষী।’

আর গণেশবাবুর চিঠিতে লেখা ছিল :

‘মাস্টারমশাই, অন্ধকার রাত্রে আমায় পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন—আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আপনি ভালো এবং নিরীহ লোক। তাই কাল রাত্রে আমি সামান্য কিছু কর্তব্য করে আপনাকে রক্ষা করেছি। আজ এই পর্যন্ত। —কালো হাত।’

আট

নীলকুঠির জঙ্গল। আগে জঙ্গল ছিল না, পাশ দিয়ে যে-মরা নদীটা বালির মধ্যে লুকিয়ে গিয়েছে, ওরও অবস্থা ছিল এরকম—দূরের মহানন্দ তখন কানায় কানায় ঘোলা জল নিয়ে ঘূর্ণি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বয়ে যেত, আর তারই জলে ছাড়া ফেলত নীলকুঠির ব্যারাকের মতো সমকোণের ধরনে গড়া মস্ত বাড়িটা।

আশেপাশের দশখানা গ্রামে সাহেবরা জোর করে নীলের চাষ করাত, বুকের রক্ত আর চোখের জলে মাটি ভিজিয়ে চাষার ফলাত সেই সর্বনেশে ফসল। পেটের ভাত জুটত না—জুটত সাহেবের লাথি আর চাবুক। যারা অস্বীকার করত, সাহেবরা তাদের ধরে নিয়ে গিয়ে গুম করে ফেলত, পৃথিবীতে কেউ আর কোনওদিন তাদের দেখতে পেত না। তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হতো, আত্মীয়-স্বজনেরা ত্রাহি ত্রাহি করে যেদিকে পারে পালিয়ে বাঁচত।

তারপর এল প্রজা-বিদ্রোহ। অত্যাচারে জর্জরিত মানুষগুলো মাথা তুলে দাঁড়াল। যবনিকা পড়ল নীলকরদের ভয়াবহ অত্যাচারের ওপরে। নীলকুঠি খালি হয়ে গেল।

নীলকুঠি খালি হল বটে, কিন্তু তবু মানুষ সহজে সেদিকে আসতে পারত না। সকলের মনের ভেতর জায়গা করে নিয়েছিল একটা বিচিত্র ভয়, একটা আশ্চর্য আতঙ্ক। দুপুরের বাতাসে ওই বাড়িটার দিক থেকে যেন কাদের দীর্ঘশ্বাস হু-হু করে ভেসে আসত, মনে হত রাত্রের অন্ধকারে কারা যেন ওখানে গুমরে গুমরে কাঁদছে। লোকে ভয়ে ওদিকে হাঁটাই ছেড়ে দিল।

চলতে লাগল সময়ের স্রোত।

নিমগ্ন হয়ে রইল। মাঝে মাঝে জ্যোৎস্না রাত্রে নাকি দেখা যায়, কারা যেন ঘোড়া ছুটিয়ে ওই জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। তারা মানুষ নয়—মানুষের ছায়ামূর্তি। কত লোক যে ওখানে ভয় পেয়েছে তার আর সীমাসংখ্যা নেই।

মাঝরাত্তিতে ওই জঙ্গলে যেতে হবে নিতাই সরকারকে তাও আবার একা! এমন কথা কী স্বপ্নেও ভাবতে পারে নাকি কেউ?

সারাটা দিন নিতাই ঘরের মধ্যে আফিংখোরের মতো বসে বসে ঝিমোতে লাগল। কী যে হবে বুঝতে পারছে না। ওদিকে শরীরী হোক আর অশরীরী হোক, রাত্রে শ্বীমন্ত রায়ের সেই বিভীষিকা তাকে মাত্র তিন দিনের সময় দিয়ে গেছে—আজকে শেষ রাত্রি। কালকে যে তার অদৃষ্টে কী ঘটবে এক ভগবানই বলতে পারে সে কথা।

কিন্তু এই বন্ধুটি কে? শ্বীমন্ত রায়ের কথাই বা জানবে কী করে? মানিকপুর স্টেশনে যে-ঘটনাগুলো ঘটে গেল তারই বা অর্থ কী? সবকিছু একসঙ্গে মিলিয়ে সে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল।

পালিয়ে যাবে? পালিয়ে যাবে এখান থেকে? কিন্তু কোথায়? যে অশরীরী, তার হাত থেকে কোথাও কি নিস্তার আছে? তার চাইতে বন্ধুর উপদেশটাই কানে তোলা যাক। দেখা যাক—যদি কিছু হয়।

রাত এগারোটা। শুক্লা তৃতীয়ার চাঁদ বনের আড়ালে অস্ত গেছে। চারদিক থমথমে অন্ধকার। আকাশে যে-নক্ষত্রগুলো জ্বলছিল তারাও যেন কী-একটা ভয়ে আড়ষ্ট আর পাণ্ডুর হয়ে গেছে। দূরের মাঠে আলেয়ার আগুন থেকে-থেকে স্কন্ধকাটার রাক্ষুসে হাসির মতো দপ-দপ করে উঠছিল—আর কোথায় যেন কঁকিয়ে কঁকিয়ে কাঁদছিল একটা কুকুর। অমন করে কুকুর কাঁদলে নাকি গৃহস্থের অমঙ্গল হয়।

নানা দুশ্চিন্তায় নিতাই এতক্ষণে যেন বেপরোয়া হয়ে গেছে। যা হওয়ার তা হোক, ব্যাপারটার একটা শেষ দেখবে সে। এমনিও ভুবছে, অমনিও ভুবছে—কাজেই যা-হয় একটা হেস্তনেস্ত করে নিতেই হবে।

কাপুরুষ সে নয়। কোনও কিছুকেই সে ভয় করে না, খুনখারাপিতে সে ভয় পায় না। তা যদি পেত তা

হলে শ্ৰীমন্ত রায়ের পিঠে আমন করে ছোরা বিঁধিয়ে সে টাকাগুলো নিয়ে সরে পড়তে পারত না। ভয় তার মানুষকে নয়—অপদেবতাকে; শ্ৰীমন্ত রায়কে নয়—তার প্রেতাত্মাকে। মানুষের সঙ্গে একহাত মহড়া সে নিতে পারে, কিন্তু ভূতের সঙ্গে লড়াই করবে কেমন করে?

কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, শ্ৰীমন্ত রায় মরেনি। যদি না মরে থাকে, তাহলে তাকে আর ভয় কিসের? তার সঙ্গে যদি চালাকি করতে আসে তাহলে সেও দেখে নেবে—সহজে ছাড়বে না। হিংস্র উত্তেজনায় নিতাইয়ের দাঁত কড়মড় করে বেজে উঠল।

কাঠের একটা পুরনো বাক্সের ভেতর থেকে নিতাই একটা রিভলভার বের করে আনল। দোনলা বন্দুকের কাজ নয়। রিভলভারের লাইসেন্স তার নেই, এটা বেআইনি অস্ত্র। দরকার হতে পারে বলে এটাকে সে কাছে রেখেছে। রিভলভারের পাঁচটা ঘরে সে কার্তুজ ভরে নিল, সঙ্গে নিল আরও কিছু বাড়তি কার্তুজ আর তিন শেল-এর একটা টর্চ। তারপর ঘাড়ে মাথায় একটা কালো রুমাল জড়িয়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

বুকটা টিপটিপ করছিল—কিন্তু নিতাই সংযত করল নিজেকে। নাঃ, ভয় পেলে তার চলবে না, ঘাবড়ে গেলে সব মাটি হয়ে যাবে। হয় শ্ৰীমন্ত রায়ের আজ একদিন, অথবা তার শেষ। এসপার কিংবা ওসপার।

কিন্তু এই বন্ধুটি কে? সবই রহস্যময়। তবু দেখা যাক। হাতের মধ্যে রিভলভারটা শক্ত করে বাগিয়ে ধরে সে এগুতে লাগল ।

অন্ধকার, নির্জন গ্রামের পথ। চারদিক থমথম করছে, পাতাটি কোথাও নড়ছে না। শুধু আকাশের তারাগুলো যেন হিংস্রভাবে জ্বলছে, আর দূরে-দূরে জ্বলছে আলেয়া। একটা কুকুর তাকে দেখে খেকিয়ে উঠল—নিতাই ভ্রুক্ষেপ না করে এগিয়ে চলল।

কিন্তু সে যা টের পায়নি—অন্ধকারের ভেতরে একটি ছায়ামূর্তি তাকে নিঃশব্দে অনুসরণ করে আসছে। সে থামলে থামছে, এগুলে এগুচ্ছে। সেই মূর্তির মুখ মানুষের নয়—নরকঙ্কালের। তার অস্থিময় মুখের কোটরের ভেতরে দুটো চোখ আগুনের হলকার মত ঝিলিক দিচ্ছে। তার হাত মানুষের হাত নয়—সে-হাত গরিলার হাতের মতো বড়,—এক ইঞ্চি পরিমাণ ধারালো বড়-বড় তার নখ, আর কুচকুচে কালো সেই হাতখানা টকটকে রক্তে রাঙানো !

নয়

নীলকুঠির জঙ্গল ।

নীলকুঠির ভূতুড়ে বাড়িটা ভেঙেচুরে শেষ হয়ে গেছে। বেশির ভাগ ঘরেরই দেওয়াল আছে, ছাত নেই। দরজা জানলাগুলো ভেঙে কবে যে ধুলোয় মিশে গেছে কেউ তা বলতে পারে না। বাড়িটার এখানে-ওখানে সর্বত্র শিকড় জেগেছে, মাথা তুলেছে ছোট-বড় অশ্বত্থ গাছের সারি। কালো অন্ধকারে ঢাকা সেইসব অশ্বত্থের থেকে মাঝে মাঝে একটা কালপ্যাঁচা ভুতুড়ে গলায় 'ধু-ধু-ধু-ম' শব্দ করে ডেকে উঠছে।

এই বাড়ির একটা ভাঙা ঘরের ভেতরে একটা মোমবাতির আলো মিটমিট করে জ্বলছে। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিরিঞ্চি। তার হাতে একখানা ধারালো ছোরার আঠারো ইঞ্চি ফলা মোমবাতির আলোয় রাক্ষসের জিভের মতো লকলক করছে। মেঝেতে শুয়ে আছে অনাদি—তার একটা পায়ে ময়লা ন্যাকড়ার ব্যান্ডেজ বাঁধা, তা থেকে চুইয়ে চুইয়ে তখনও রক্ত পড়ছে। দুটো হাত শক্ত করে বাঁধা অনাদির–চোখ দুটো ভয়ে যেন কোটর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসছে।

কাতর অসহায় কণ্ঠে অনাদি বললে, আমাকে মেরো না !

বিরিঞ্চি হেসে উঠল। জোরে নয়—চাপা, নিষ্ঠুর তার হাসি। তারপর অনাদির কথার জবাব না দিয়ে আঙুলের মাথায় ছোরাটার ধার পরীক্ষা করতে লাগল। এক ঘায়ে একেবারে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেওয়া যাবে কি না সেটাই দেখছে।

অনাদি আবার কাতর স্বরে বললে, কেন আমাকে মারবে? আমি কী করেছি?

—তোমাকে না মারলে আমার উপায় নেই।

—কেন?

—তোমার, পায়ে চোট লেগেছে—শ্ৰীমন্ত রায়ের গুলি উরু দিয়ে বেরিয়ে গেছে। তুমি পালাতে পারবে না —ধরা পড়বেই। তারপর তোমার দৌলতে আমাকে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে। কাজেই আগেভাগে নিশ্চিন্ত হতে চাই।

—মিথ্যাবাদী, শয়তান!—অনাদি গর্জে উঠল: তোমার মতলব আমি বুঝতে পেরেছি। নিতাই সরকারের কাছ থেকে যে-টাকা আদায় করবে ভেবেছ, তার ভাগ আমাকে দিতে চাও না। তাই তোমার এইসব ছুতো ! শ্ৰীমন্ত রায়ের গুলি না লাগলেও তুমি আমাকে খুন করতে।

—তা করতাম—নির্বিকার নিরাসক্ত গলায় বিরিঞ্চি জবাব দিল।

—এই তোমার বন্ধুত্ব?

—শয়তানে শয়তানে বন্ধুত্ব এইরকমই হয় বন্ধু—আবার হিংস্র চাপা গলায় বিরিঞ্চি হেসে উঠল স্বার্থসিদ্ধি হলে সবটা একা গ্রাস করবার জন্যে হয় তুমি আমায় খুন করবে, নইলে আমি তোমায় খুন করব। ভাগ্যবলে চান্সটা আমি পেয়েছি—ছাড়ব কেন?

—রাক্ষস, শয়তান—অনাদি আর্তনাদ করে উঠল।

—যা খুশি বলতে পারো, নির্বিকারভাবেই বিরিঞ্চি জবাব দিল—মেল-ট্রেনের টাকাগুলো বাগানোর চেষ্টা বৃথা হয়ে গেল—বাগড়া দিল শ্ৰীমন্ত রায়। নিতাইয়ের কাছ থেকে যা পাওয়া যাবে, তাতে আমার নিজেরই কুলোবে না। কাজেই তোমাকে আর ভাগীদার রাখতে চাই না। এবার শ্ৰীমন্ত আর নিতাইকে কাবার করতে পারলেই আমার পথ পরিষ্কার।

অনাদি আবার বলল, শয়তান, বিশ্বাসঘাতক!

—বড্ড গালাগাল দিচ্ছ, আর বেশিক্ষণ তোমার বাঁচা উচিত নয়। রেডি হও। ওয়ান—টু—

ছুরি হাতে বিরিঞ্চি এগুতে লাগল। বিস্ফারিত ভীত চোখে অনাদি পালাবার চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুতেই উঠতে পারল না।

—আমাকে মেরো না, তোমার পায়ে পড়ি—মেরো না, আমি ভাগ চাই না, আমাকে ছেড়ে দাও। অনাদির অসহায় চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

তা হয় না—বিরিঞ্চির গলার স্বর পাথরের মতো কঠিন।

—আমাকে মেরো না—আমাকে মে— মোমবাতির আলোয় ছোরাতে বিদ্যুৎ ঝলকে উঠল। ধপ করে সেটা নেমে এল অনাদির বুকের ওপরে, বসে গেল বাঁট পর্যন্ত । আ—আ—আ ।

অন্তিম আর্তনাদ। বারকয়েক হাত-পা ছুড়েই শান্ত হয়ে গেল। অনাদির বিস্ফারিত চোখের ওপর নেমে এল শাদা কাপড়ের একটা পর্দা। আর বিরিঞ্চি ছোরাটা ফস করে সজোরে টেনে বার করে আনতেই এক-হাত উঁচু হয়ে ছিটকে বেরুল রক্তের ফোয়ারা। লাগল দেয়ালে, লাগল বিরিঞ্চির গায়ে।

অনাদির জামাটাতে ছোরার রক্ত মুছে নিয়ে বিরিঞ্চি সোজা হয়ে দাঁড়াল। মুখে নিশ্চিন্ততার একটুকরো হাসি। একটা আপদ গেছে, আরও দুটো বাকি। তাদের অবস্থাও এমনই হবে।

ফুঁ দিয়ে মোমবাতিটা সে নিবিয়ে দিল। ঘরে ঘনিয়ে এল ভৌতিক কৃষ্ণ ছায়া। প্যাঁচটা আবার ডেকে উঠল : ধু-ধু-ধুম-ধু-ধু-ধুম !

এমন সময় জঙ্গলের ভেতরে একটা তীব্র টর্চের আলো এসে পড়ল—যেন তলোয়ারের ফলা চিরে দিল নীলকুঠির জঙ্গলের প্রেতাচ্ছন্ন রাত্রিকে।

আর কেউ নয়—নিতাই সরকার।

দশ

নিতাই খানিকক্ষণ বিহ্বলভাবে দাঁড়িয়ে রইল অন্ধকার নীলকুঠির সামনে। বাতাস উঠেছে। চারদিকের বন-জঙ্গলে বাজছে একটা ভৌতিক মর্মর—যেন অতীতযুগের যত প্রেতাত্মা আজ এই অন্ধকার রাত্রে নীলকুঠির জঙ্গলে হানা দিয়েছে। অসংখ্য জোনাকি জ্বলছে ঝোপে-ঝাড়ে—তাদের হিংস্র চোখ থেকে ঠিকরে-পড়া আগুনের স্ফুলিঙ্গ যেন। ..

নিতাইয়ের বুক কাঁপতে লাগল। এ কোথায় এল—কার সর্বনাশা আকর্ষণে এখানে এসে পড়ল সে? জঙ্গলের কোলে ঘন অন্ধকার যেন তাকে ঠেসে ধরেছে, যেন তার দম আটকে আসছে! কে এই বন্ধু—এমন অস্থানে এমন অসময়ে তাকে ডেকে আনল? সে কি সত্যি-সত্যিই বন্ধু, না কোনও শত্রুর ফাঁদ?

নিতাই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ, ভয়ব্যাকুল চোখ দুটো বুলিয়ে নিল পোড়ো নীলকুঠির ভয়াবহ রহস্যময়তার ওপরে। তারপর চেপে ধরল পকেটের রিভলভারটা। নিজের অস্ত্রটার নিষ্ঠুর শীতল স্পর্শে তার নিজের শরীরটাই যেন শিউরে উঠল।

ফিরে যাবে? বোধহয় ফিরে যাওয়াই ভাল, কিন্তু—যাবে কি যাবে না ভাবতে ভাবতেই সে চমকে লাফিয়ে উঠল । তার কাঁধের ওপর কার একখানা হাত পড়েছে। যেন মানুষের হাত নয়, চারিদিকের আঁধারই একখানা লম্বা হাত বার করে তার কাঁধের ওপর রেখেছে!

অস্বাভাবিক গলায় নিতাই বলল, কে?

আঁধারের ভেতর থেকেই জবাব এল, এসো—

নিতাই পকেটের রিভলভারটা ধরবার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু ভয়ে আর উত্তেজনায় তার হাতটা থরথর করে কাঁপছে। তেমনি বিকৃত গলায় সে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কে?

জবাব এল, বন্ধু!

ওরা কেউ দেখতে পায়নি, একটু দূরে আর-একটি ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে। তার মুখ মানুষের নয়, কঙ্কালের। তার হাত মানুষের নয়, গরিলার মতো, বড় আর সেই হাতখানা টকটকে রঙে রঙিন।

কঙ্কাল-মূর্তিটা নিঃশব্দে হাসছিল—হঠাৎ তার হাড়ের দাঁতগুলো খটখট করে বেজে উঠল।

নিতাই চমকে বলল, ও কী।

বন্ধু জবাব দিল, কিছু না—বোধহয় কটকটে ব্যাঙ।

ঘরে ঢুকে মোমবাতির আলোটা জ্বালাল বিরিঞ্চি। তারপর নিজের পিস্তলটা নিতাইয়ের দিকে ঘুরিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। নিঃশব্দে একটা ভয়ঙ্কর হাসি হেসে বলল, চিনতে পারছ?

ততক্ষণে আতঙ্কে পাথর হয়ে গেছে নিতাই। মোমবাতির মৃদু আলোয় চোখে পড়ছে ঘরের ভেতরের বীভৎস সেই অমানুষিক দৃশ্যটা, মেঝেতে তাজা রক্তের স্রোত বইছে—নিতাইয়ের পায়ের নীচে সে-রক্ত আঠার মতো চটচট করে উঠল। আর রক্তের সেই পৈশাচিক সমারোহের মধ্যে পড়ে আছে একটা মৃতদেহ —মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। প্রসারিত হাতের দুটো মুঠি শক্ত করে আটা, অন্তিম যন্ত্রণায় পায়ের আঙুলগুলো পর্যন্ত দোমড়ানো।

কিন্তু তার চাইতেও বড় বিভীষিকা নিতাইয়ের সামনেই দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হাসছিল। তার হাতের ছোট রিভলভারের নলটা তারই বুকের দিকে উদ্যত হয়ে আছে—তার শাদা শাদা বড় বড় দাঁতগুলো ক্ষুধার্ত জানোয়ারের মতো যেন তাকে তাড়া করে আসছে।

নিতাই অস্ফুট গলায় বলল, বিরিঞ্চি।

বিরিঞ্চি আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিল মৃতদেহটার দিকে : আর অনাদি।

নিতাইয়ের সমস্ত জ্ঞান যেন লুপ্ত হয়ে গেল—মাথা ঘুরে রক্তাক্ত মেঝের ওপরেই বসে পড়ল সে। শুধু তেমনি করেই সামনে দাঁড়িয়ে পিশাচের মতো হাসতে লাগল বিরিঞ্চি। ...কয়েক মিনিট পরে নিতাই উঠে দাঁড়াল। কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল অনাদিকে কে খুন করেছে?

—আমি।

—কেন?

—দরকার ছিল। কিন্তু—বিরিঞ্চি বিকটভাবে সেইরকম শব্দহীন হাসি হাসল ; ভয় নেই, তোমাকে খুন করব না। বলছি তো, আমি তোমার বন্ধু।

—বন্ধু! কী রকম বন্ধু তা আমি জানি। নিতাইয়ের হাত পা কাঁপছে: আমার কাছে তুমি কি চাও?

—কিছুই না—পুরনো বন্ধু, একটু আলাপ-পরিচয় আর-কি। বিরিঞ্চি নিশ্চিন্তভাবে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল : তাছাড়া একটু দাবিও আছে। আশা করি বন্ধুকে বিমুখ করবে না!

—কী দাবি?

—কিছু টাকা—

—কীসের টাকা?

—কেশবদাসের সিন্দুক থেকে নেওয়া হাজার টাকার অর্ধেক—

—সে-টাকার আমি কিছু জানি না—

—জানো না? বিরিঞ্চি তেমনি হাসতে লাগল ; এ-কথা তোমার কাছ থেকে একেবারে আশা করিনি, তা নয়। লজ্জা কী বন্ধু, সত্যি কথাটা সবাই জানে। সবই চাই না, মাত্র সাড়ে সাত হাজার পেলেই আমি চলে যাব—

—মিথ্যে কথা, আমার টাকা নেই।

—নেই? নিশ্চিন্তভাবে বিরিঞ্চি বললে, তোমার টাকা নেই? আমার রিভলভারে টোটা আছে। অনর্থক কেন বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটাচ্ছ বল দেখি? রাজি হয়ে যাও—

—সে টাকায় তোমার দাবি নেই, আছে শ্ৰীমন্ত রায়ের—

—একই কথা। দাও, টাকাটা দিয়ে ফেলো চটপট—

—না।

—দেবে না? বিরিঞ্চি অনাদির মৃতদেহটা দেখিয়ে দিল, ক্ষুব্ধস্বরে বলল, তা হলে আমাকে আর-একটা খুন করতেই হল দেখা যাচ্ছে—

নিতাই আর্তনাদ করে উঠল, হাতটা চলে গেল পকেটের ভেতর।

—খবরদার!

হঠাৎ আকাশ-ফাটানো গলায় চেঁচিয়ে উঠল বিরিঞ্চি : খবরদার, আমি জানি তোমার পকেটে পিস্তল আছে। কিন্তু বার করবার চেষ্টা কোরো না—তার আগেই মিছিমিছি প্রাণটা খোয়াবে।

বিরিঞ্চির পিস্তলটা নিতাইয়ের প্রায় বুকের কাছাকাছি এসে ঠেকেছে—ট্রিগারে একটা আঙুল তৈরি হয়ে আছে। .

হাল ছেড়ে দিল নিতাই। হতাশভাবে বলল, কিন্তু আমার কাছে তো টাকা নেই—

—না, তোমার ব্যাঙ্কে আছে। সে আমি জানি। তা ভালো, ছেলের মতো এটা সই করে দাও দেখি—

—কী এ?

—চেকবই।

—চেকবই ! এ যে আমার ব্যাঙ্কের চেকবই ! এ কোথায় পেলে?

বিরিঞ্চি মুচকি হাসল: কোন ব্যাঙ্কে টাকা আছে জানলে চেকবই যোগাড় করা এমন আর শক্তটা কী! নাও —সই কর—

—আমি সই করব না।

কালো রিভলভারটা নাচিয়ে বিরিঞ্চি বললে, করবে না?

—না।

—তা হলে অনাদির দিকে একবার তাকাও।

—দাও সই করছি—নিতাই হাত বাড়াল : কিন্তু কলম?

—এই নাও—পকেট থেকে ফাউন্টেন পেন বার করে দিল বিরিঞ্চি।

—কত টাকা লিখব?

রিভলভারটা নাচিয়ে বিরিঞ্চি বললে, লিখবে হবে না—শুধু সই কর।

—তার মানে? ব্ল্যাঙ্ক চেক?

—হাঁ—ব্ল্যাঙ্ক চেক।

সভয়ে নিতাই বলল, তুমি যদি আমার সব টাকা তুলে নাও?

—বন্ধুকে বিশ্বাস করো।

—না, সই করব না।

—তা হলে—বিরিঞ্চি পিস্তল বাগিয়ে ধরল।

—দাও সই করেছি—খসখস করে চেকে স্বাক্ষর করে দিল নিতাই। তারপর মাথায় হাত দিয়ে মেঝেয় বসে পড়ল। আজ তার সর্বস্ব গেল—আজ সে পথে বসেছে। কিন্তু—কিন্তু—নিতাইয়ের চোখ ঝিলিক দিয়ে উঠল। এর শোধও সে নিতে পারবে ! ও টাকা হজম করবার ক্ষমতা বিরিঞ্চির হবে না।

নিতাই বলল, এবার আমাকে যেতে দাও—

–হাঁ দিচ্ছি, বিরিঞ্চি রক্তমাখা ছোরাটা হাতে তুলে নিলে। মোমবাতির আলোয় ঝিকিয়ে উঠল রাক্ষসের জিভ। ছোরাটা শক্ত করে মুঠোর মধ্যে আঁকড়ে ধরে বিরিঞ্চি এগুতে লাগল নিতাইয়ের দিকে।

নিতাই সভয়ে চেঁচিয়ে উঠল, এ কী !

এবার বিরিঞ্চি শব্দ করে হাসল, টেনে টেনে হাসল।

—নিতাই সরকার, ভেবেছ তুমিই সবচেয়ে চালাক, তাই নয়? আজ চেকে সই করে দিয়েছ, কালই কলকাতায় ব্যাঙ্কে তুমি টেলিগ্রাম করে দেবে, তারপর চেক ভাঙাতে গেলেই আমার হাতে দড়ি পড়বে। না —অত বোকা আমি নই।

পাংশু পাণ্ডুর মুখে নিতাই বলল, তুমি কী করতে চাও?

—শত্রুর শেষ রাখব না—

তীরের মতো বেগে নিতাই দাঁড়িয়ে উঠল, টেনে বার করে আনল রিভলভারটা। কিন্তু তার আগেই বিরিঞ্চির ছোরা তার বুকে এসে বিঁধেছে। নিঃশব্দে একটা ভারি বস্তার মতো অনাদির রক্তাক্ত দেহের ওপর গড়িয়ে পড়ল নিতাই। —একটা আর্তনাদ করবারও সময় পেল না।

বিরিঞ্চি গর্জে উঠল—কেল্লা ফতে

আর সেই মুহূর্তেই কঠিন ভয়াবহ গলায় কে বলল, একটু দাঁড়াও বিরিঞ্চি—সবটা এখনও শেষ হয়নি।

সাপের ছোবল খাওয়ার মতো লাফ দিয়ে উঠল বিরিঞ্চি। শ্ৰীমন্ত রায়ই বটে! কোনও সন্দেহ নেই—শ্ৰীমন্ত রায়েরই কণ্ঠস্বর!

তীরবেগে বিরিঞ্চি রক্তমাখা ছোরাখানা তুলে ধরল। কিন্তু কোথাও কেউ নেই। চারদিকের অন্ধকার সীমাহীন সমুদ্রের মতো। তার ভেতর কিছুই চোখে পড়ল না। অন্ধকারের মধ্যে আবার সেই ভয়ঙ্কর স্বর উঠল: রিভলভারটা হাত থেকে ফেলে দাও বিরিঞ্চি।

শ্ৰীমন্ত রায়! বিকট গলায় বিরিঞ্চি চেঁচিয়ে উঠল। তারপর শব্দ লক্ষ্য করে ছোরা তুলে ঝাঁপ দিতেই দুম করে এল একটা গুলির আওয়াজ। অসহ্য যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল বিরিঞ্চি—আহত হাত থেকে শব্দ করে ছোরাখানা ঝনঝন করে মেঝের ওপর খসে পড়ল!

বাঁ হাতে বিরিঞ্চি রক্তঝরা ডান হাতখানা চেপে ধরল, তারপর আতঙ্কে বিহ্বল চোখ মেলে চেয়ে রইল রহস্যময় অন্ধকারের ভেতর। সামনেই কোথাও তার অদৃশ্য শৎব্রু মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, লক্ষ করছে তার প্রত্যেকটি চাল-চলন, তার প্রত্যেকটি কাজ। এই অলক্ষ্য আততায়ীর কাছে অসহায়ভাবে আত্মসমৰ্পণ করা ছাড়া তার কোনও উপায় নেই।

সহসা শ্ৰীমন্ত রায় আবার বলল, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো বিরিঞ্চি ! যা বলি, তা মন দিয়ে শোনো। অনেক অপরাধ তুমি করেছ, তার জন্যে আজ তোমায় দণ্ড নিতে হবে। কিন্তু বিনা বিচারে শিাস্তি তোমায় দেব না। তোমার কী জবাবদিহি করবার আছে, আগে তাই শুনে নিতে চাই।

বিকৃত স্বরে বিরিঞ্চি বলল, সাহস থাকে তো সামনে এসে দাঁড়াও শ্ৰীমন্ত রায়। অমন করে কাপুরুষের মতো আড়ালে থেকো না।

—কাপুরুষ —হা-হা করে একটা বীভৎস হাসির আওয়াজ পোড়ো বাড়িটার থমথমে ভৌতিক রাত্রিকে কাঁপিয়ে তুলল—এ-কথা অন্তত তোমার মুখে মানায় না বিরিঞ্চি হাটলোর ফাঁকা পাটগুদামে পেছন থেকে আমার পিঠে ছোরা মারবার সময় এ-বীরত্ব তো তোমার ছিল না!

বিরিঞ্চি বলল, থামো থামো, শুধু একটা কথার জবাব দাও। তুমি কি মানুষ—অথবা প্রেত? মৃত্যুর ওপার থেকেই তুমি প্রতিশোধ নিতে এসেছ?

শ্ৰীমন্ত রায়ের অলক্ষ্য কণ্ঠ আবার তীক্ষ ভয়ঙ্কর মুখর হয়ে উঠল, বলল, সে-প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু ডান হাতটা খুইয়েছ বিরিঞ্চি, আবার বাঁ হাতটাও খোয়াতে চাও? হ্যাঁ, তোমায় স্পষ্ট আমি দেখতে পাচ্ছি। পকেটে হাত দিতে চেষ্টা কোরো না-ওখানে তোমার পিস্তল আছে তা আমি জানি। এও জানি যে, বাঁ হাতেও তুমি সব্যসাচীর মতো গুলি চালাতে পারো।

সভয়ে বাঁ হাতটা পকেট থেকে টেনে বার করে আনল বিরিঞ্চি। কাঁপা গলায় বলল, তুমি কী বলতে চাও?

—সেটা বলতেই তো চেষ্টা করছি, কিন্তু তার আগে তোমাকে একটু ধৈর্য ধরতে হবে। অস্থির হয়ে উঠলে নিজের ক্ষতি নিজেই আরও বেশি করবে—আশা করি সেটা বুঝতে পারছ।

—কী করতে হবে?—হতাশ স্বরে বিরিঞ্চি জানতে চাইল।

—বসো ওই মেঝের ওপর।

বিরিঞ্চি বসল। টের পেল তলায় একটা ঠাণ্ডা আঠার স্রোত। মুহূর্তে বিরিঞ্চির সারা শরীর কুঁকড়ে উঠল। নিতাই অথবা অনাদির রক্ত—অথবা দুজনেরই। কিন্তু একতিল নড়ে বসতে তার সাহস হল না ।

অদৃশ্য স্বর বলল, মনে আছে বিরিঞ্চি, একদিন এই শ্ৰীমন্ত রায় আদর্শ ভালো ছেলে ছিল? বন্ধু হয়ে তার কাছে তুমি এগিয়ে এলে, তারপর—

বিরিঞ্চি বলল, ও-সব কথা কেন?

—বাধা দিয়ো না। মনে রেখো, আজ তোমার বিচার। গোড়া থেকে সব কথাই তোমায় শুনতে হবে।

বিরিঞ্চি দীর্ঘশ্বাস ফেলল, বলল, বলে যাও।

—আমার টাকা ছিল—আমি ছিলাম সরল, ছিলাম নির্বোধ। নির্বুদ্ধিতার সুযোগ নিয়ে তুমি আমাকে নিয়ে ভিড়িয়ে দিলে রেসের মাঠে। যত বাজি হারতে লাগলাম, টাকাগুলো যত পাখনা মেলে উড়ে যেতে লাগল —যত আমি পালাতে চেষ্টা করতে লাগলাম, ততই আমায় তুমি আঁকড়ে রাখলে। দুঃখ ভোলাবার জন্যে ধরালে মদ-সর্বনাশের রাস্তা সহজ করে দিলে।

বিরিঞ্চি আবার উসখুস করে উঠল।

—দাঁড়াও বিরিঞ্চি, দাঁড়াও—শ্ৰীমন্ত রায়ের তিক্ত গলা শুনতে পাওয়া গেল : সেদিন ভিক্ষুক করে যদি তুমি আমায় ছেড়ে দিতে তাহলে আমি তোমায় ক্ষমা করতাম। কিন্তু সেইখানেই তুমি থামলে না। যখন তুমি আমাকে নিঃস্ব করে দিলে, তখন নিয়ে এলে লোভ। আর সেই লোভের ফাঁদে আমি অসহায়ের মতো পা দিলাম।

বিরিঞ্চি জবাব দিল না।

—মদের নেশায় তখন আমার কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান ছিল না। সেই সুযোগে একটা জালিয়াতির ব্যাপারে তুমি আমায় জড়িয়ে দিলে। তখন আমার ঘোর ভাঙল। দেখলাম, এখন আমায় যে করে হোক তোমার হাত থেকে পালাতেই হবে। কিন্তু সে-পথ তুমি আমার রাখেনি। আমার মৃত্যুদণ্ড তোমার মুঠোর মধ্যে। যে-সব কাগজপত্র তোমার কাছে ছিল তা দিয়ে অনায়াসে তুমি আমাকে সাত বছর জেল খাটাতে পারতে। নিরুপায় হয়ে তোমার দয়াতেই নিজেকে আমি সঁপে দিলাম।

কাতর গলায় বিরিঞ্চি বললে, ভুলে যাও শ্ৰীমন্ত, ভুলে যাও। ও-সব পুরনো কথা কেন টেনে তুলছ?

—বলেছি তো, আজ তোমার বিচার। সব শুনতে হবে বিরিঞ্চি । সংক্ষেপেই বলব, কিন্তু একটা শব্দও বাদ দেওয়া চলবে না। পৃথিবীতে অনেক শয়তান জন্মেছে, কিন্তু তাদের মধ্যেও কিছু না-কিছু মনুষ্যত্ব ছিল। কিন্তু ওসবের বিন্দুমাত্র বালাই তোমার ছিল না বিরিঞ্চি। এদিক থেকে তুমি নিরঙ্কুশ–তোমার তুলনা হয় না।

—শ্ৰীমন্ত!

—আজ তোমার গলা কাঁপছে কেন বিরিঞ্চি? কোনও অন্যায়—কোনও পাপেই তো কখনও তুমি এতটুকু টলোনি। আজ এ-দুর্বলতা কেন তোমার। এখন যা বলছি—নিঃশব্দে শুনে যাও।

বিরিঞ্চি নিরুত্তর হয়ে রইল। আহত ডানহাতের তালুতে তীব্র যন্ত্রণা। বুড়ো আঙুলের তলাকার হাড়টা গুড়ো হয়ে গেছে, এখনও রক্ত পড়ছে গড়িয়ে। সেটাকে প্রাণপণে টিপে ধরে বিরিঞ্চি বসে রইল।

—তারপর—অদৃশ্য শ্ৰীমন্ত বলে চলল: তারপর থেকে আত্মরক্ষার কোনও উপায় আমার আর রইল না। নিরাপদে পেছনে বসে থেকে আমায় পাপের পথে ঠেলে দিতে লাগলে। চুরি, জুয়াচুরি, জালিয়াতি, ডাকাতি —কিছুই বাদ গেল না । আর এমনি কায়দায় তুমি কাজগুলি করতে যে, ধরা পড়লে আমি জেলে যাব, তোমার গায়ে কুটোটির আঁচড়ও লাগবে না। খুব বুদ্ধিমানের মতো ব্যবস্থা, সন্দেহ কী ! নির্বাক মুখে আমি তোমার প্রত্যেকটি আদেশ পালন করে চললাম। জানতাম, একবার যদি তোমার হুকুম অমান্য করি, তুমি

আমায় সাত বছরের মতো জেলখানায় ঘানি ঘুরোতে পাঠিয়ে দেবে।

—থামো শ্ৰীমন্ত —বিরিঞ্চি আর্ত হয়ে বলল, আর কেন ও-সব? যেতে দাও ও-সব কথা। যা হওয়ার হয়ে গেছে। এবার এসো—নিতাইয়ের টাকাটা আমরা ভাগাভাগি করে নিই—রফা হয়ে যাক সবকিছু।

—ঘুষ?—শ্ৰীমন্তর হাসি শোনা গেল : লোভ দেখাচ্ছে আমাকে। কিন্তু ও-চালাকি পুরনো হয়ে গেছে বিরিঞ্চি হালদার, ওতে আর আমায় ভোলাতে পারবে না। তোমার কথার দাম কতখানি, একটু আগেই অনাদি তার পরিচয় পেয়ে গেছে। আমাকে অত বোকা তুমি ভেবো না।

—বিশ্বাস করো, একবার সুযোগ দাও আমাকে—বিরিঞ্চি প্রার্থনা করল।

—সুযোগ তুমি অনেক পেয়েছ বিরিঞ্চি, আর নয়। সব সুযোগেরই একটা সীমা আছে। ও সব কথা এখন থাক। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। আমার প্রতি শেষ কর্তব্য তুমি পালন করলে কেশবদাস মাগনিরামের ব্যাপারে। আমাকে ছোরাটা ঠিকই মেরেছিলে তোমরা, কিন্তু কপাল-জোরে আমি বেঁচে গেলাম। কী করে? সে অনেক কথা। কিন্তু তারপরেই মনে হল, তোমরা তিনজন—তুমি, অনাদি আর নিতাই—তোমাদের কাছে আমার অনেক ঋণ। সে-ঋণ আমায় শোধ করতেই হবে। বিশেষ করে তুমি আমার সর্বশ্রেষ্ঠ মহাজন!

বিরিঞ্চি চিৎকার করে উঠল; আমায় ছেড়ে দাও শ্ৰীমন্ত। এ-টাকার সবটা তুমিই নাও—শুধু আমাকে মুক্তি দাও, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি।

—ক্ষমা?—শ্ৰীমন্ত আবার সেই ভয়ঙ্কর হাসি হাসল: তোমাকে ক্ষমা করবার পরিণাম কী, আমি কি তা জানিনে বন্ধু? গোখরোর মতো তুমি আমায় খুঁজে বেড়াবে—তোমাকে হাড়ে-হাড়ে আমি চিনি। আর আমাকে যদি তুমি না-ই পাও, আমার মতো আরও কতজনের সর্বনাশ যে তুমি করবে তার হিসেব নেই। আইন তোমায় ধরতে পারবে না—এতই তুমি সতর্ক। কাজেই আজ আমার কাছ থেকে তোমায় দণ্ড নিতে হবে।

—শ্ৰীমন্ত!

—উঠে দাঁড়াও বিরিঞ্চি —বজ্রের মতো আদেশ এল।

—শ্ৰীমন্ত!

—উঠে দাঁড়াও, নইলে গুলি করব।

বিরিঞ্চি মন্ত্রমুগ্ধের মতো উঠে দাঁড়াল।

—ডানদিকে ঘুরে দাঁড়াও।

—আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চাও শ্রীমন্ত?

—এখুনি জানতে পারবে। ডানদিকে ফেরো। হাঁ—আরও, আরও দু-পা। এবার হাঁটতে আরম্ভ করো। পালাতে চেষ্টা কোরো না বিরিঞ্চি। মনে রেখো, আমার অশরীরী চোখ আর হাতের রিভলভার তোমার সবকিছু লক্ষ করছে।

বিরিঞ্চি অন্ধকারে অন্ধের মতো হাঁটতে লাগল ।

—আর একটু ডাইনে, হ্যাঁ, আরও দু-পা চলো—চলো বিরিঞ্চি।

বিরিঞ্চি চলতে লাগল পোড়ো বাড়ির আবর্জনায় হোঁচট খেতে খেতে—পায়ের তলায় জঙ্গল মাড়িয়ে মাড়িয়ে।

—দাঁড়াও—আবার কঠোর কণ্ঠের আদেশ এল।

বিরিঞ্চি মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়াল। —আমি অশরীরী কি না জানতে চেয়েছিলে। এইবার জানতে পারবে। তোমার কাছে টর্চ আছে?

বিরিঞ্চি বিহ্বল স্বরে বলল, আছে।

—এবার সেটা জ্বালাতে পারো। পকেট থেকে আড়ষ্ট হাতে টর্চ বের করে বিরিঞ্চি। আলো ফেলল অদৃশ্য স্বর যেদিক থেকে আসছিল সেইদিকে।

কিন্তু মুহূর্তের সেই আলোতেই বিরিঞ্চির মাথার চুলগুলো খাড়া হয়ে গেল। মাত্র চার-পাঁচ হাত দূরেই যে দাঁড়িয়ে আছে সে শ্ৰীমন্ত নয়। একটা নরকঙ্কালের মুখ—ভয়ঙ্কর কালো রক্তাক্ত হাতে একটা উদ্যত পিস্তল। তার মুখের অস্থিসার দাঁতগুলোয় খট্‌খট করে প্রেতের হাসি বাজছে ।

হাত থেকে টৰ্চটা পড়ে গেল—একটা বোবা আর্তনাদ করে পিছিয়ে গেল বিরিঞ্চি। সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা আর্তনাদ চারিদিক মুখর করে দিলে। ঠিক পেছনেই পোড়ো কুয়োটার মধ্যে সে উল্টে পড়ল—আছড়ে পড়ল বারো হাত নীচের শুকনো পাটকেল-ভরা গর্তটার মধ্যে : পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘাড়টা মটকে গেল তার।

কালো হাত তার পড়ে-যাওয়া টর্চটা তুলে নিয়ে কুয়োর মধ্যে ফেলল। ওই সে চেয়েছিল। বিরিঞ্চির বিষাক্ত রক্ত নিজের হাতে আর সে ঝরাতে চায়নি।

ঘাড় মটকে পড়ে কুয়োর তলায় ঝুলে আছে বিরিঞ্চি । আর টর্চের আলোয় স্পষ্ট দেখা গেল, ভাঙা ইটের ভেতর থেকে সক্রোধে গলা বার করে এক বিশাল, দুধরাজ গোখরো বিরাট ফণা তুলে বিরিঞ্চির অসাড় দেহে একটার পর একটা ছোবল মেরে চলেছে। টর্চের আলোয় তার হিংস্ৰ চোখ দুটো ঝিলিমিল করে উঠল একবার।

এগারো

বাইরে ঝাঁ ঝাঁ করছিল রোদ। নিজের কোয়াটারে হাঁ করে ঘুমুচ্ছেন গণেশবাবু। মুখের সামনে অনেকগুলি মাছি উড়ছিল ভনভন করে, তাদের জ্বালায় বিরক্ত হয়ে মাঝে মাঝে জেগে উঠেই আবার ঝিমিয়ে পড়ছিলেন তিনি। সামনে টেবিলের ওপরে একখানা কাগজ কী সব লেখা রয়েছে, এখান থেকে বদলি হবার জন্যে গণেশবাবু দরখাস্ত লিখছিলেন, লিখতে লিখতেই ঘুমিয়ে পড়েছেন।

ভেজানো দরজাটা খুলে নিঃশব্দ পায়ে একজন লোক ঢুকল। রেলের খালাসির মতো জঙিয়া পরা, দেখলে সাধারণ একজন কুলি ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। একবার আড়চোখে সে নিদ্রিত গণেশবাবুর দিকে তাকাল, তারপরে একখানা খাম আর একটা ছোট প্যাকেট বিছানার ওপরে রেখে তেমনি নিঃশব্দে বার হয়ে গেল।

একটু পরেই মানিকপুর স্টেশনে এল দেড়টার ট্রেন, স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে চলে গেল। আর গণেশবাবুর ঘুম ভাঙল তারও প্রায় আড়াই ঘণ্টা পরে, প্রায় বেলা চারটের সময়।

তখনই তাঁর চোখে পড়ল সেই প্যাকেটটা, আর সেই চিঠিখানা। গণেশবাবু সবিস্ময়ে বললেন, এ কী। এগুলো এখানে কে রেখে গেল! আগে তিনি প্যাকেটটা খুললেন। আর খোলবামাত্র ভীত বিস্ময়ে তাঁর বাকরোধ হয়ে গেল। প্যাকেটের ভেতর থেকে পড়ল রবারের মস্ত মস্ত দুটো দস্তানা, কঙ্কালের মাথা আঁকা একটা মুখোশ।

দস্তানা দুটো সাধারণ হাতের প্রায় দ্বিগুণ, তার উল্টো পিঠে গদের আঠায় কতগুলো লোম আটকানো, আর তার মাঝে মাঝে লাল রং দেওয়া—সবটা মিলে মনে হয় সেটা যেন রক্তরঞ্জিত।

গণেশবাবু জিনিসগুলোর দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন। তারপর আড়ষ্ট হাতে খুললেন খামখানা। তার ভেতরে এই চিঠিখানা ছিল:

‘প্রিয় গণেশবাবু,

গত এক সপ্তাহের মধ্যে আপনাদের এখানে অনেকগুলো ব্যাপার ঘটে গেছে, যেগুলো আপনাদের কাছে একটা বিচিত্র রহস্য মাত্র। কয়েকজন মানুষের প্রাণ গেছে—ঘটেছে কতগুলো শোচনীয় দুর্ঘটনা। দুভাগ্যক্রমে আপনিও সে-দুর্ঘটনার হাত একেবারে এড়াতে পারেননি। সেদিন আমি সময়মতো এসে পড়তে না পারলে ও-শয়তান দুটোর গ্রাস থেকে কিছুতেই আপনাকে বাঁচাতে পারতাম না।

কিন্তু আমি কে? সেই পরিচয়টা দেবার জন্যেই এই চিঠিখানা আপনাকে লেখা—এ-থেকেই যা-কিছু ঘটেছে তার রহস্যভেদ হয়ে যাবে। আমি এখানকার সকলের বিভীষিকা—আমি ‘কালো হাত।’

চমকে উঠবেন না। আমি ভূত নই, প্রেত নই, কিছুই নই। নই যে, তার প্রমাণ ওই আলতা-রাঙানো রবারের দস্তানা আর ওই মুখোশ। আজ ওদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে, তাই আজ থেকে আবার আমি আপনাদের মতোই রক্ত-মাংসের মানুষ—আমি শ্ৰীমন্ত রায়।

‘কালো হাত’ রূপে একটা মানুষকে আমি খুন করেছি। একটা মানুষকে? না—একটা হিংস্র ভয়ঙ্কর পশুকে। তবু আমি নরহত্যা করেছি। এ-পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমি করব। কেমন করে—আপনাকে তা জানিয়ে লাভ নেই। শুধু যেটুকু জানাবার, সেটুকুই লিখছি।

আমি শ্ৰীমন্ত রায়। ভদ্রলোকের ছেলে, বিশিষ্ট বনেদি পরিবারে আমার জন্ম, লেখাপড়াও যথেষ্ট শিখেছিলাম। কিন্তু ভদ্রলোকের মতো জীবন যাপন আমি করতে পারিনি, কুসঙ্গে পড়ে অধঃপাতে গেলাম। সুনাম গেল—সব গেল। অথচ টাকার অভাব। দুশ্চরিত্র লোকের কোথাও জায়গা জোটে না, আমারও জুটল না। দেনার জ্বালায় মাথার চুল অবধি বিকিয়ে যাচ্ছে, অথচ কোনও উপায় নেই। আমি যেন উন্মাদ হয়ে উঠলাম।

এই পতনের মূলে ছিল বিরিঞ্চি। আর নিতাই সরকার—শয়তান, বিশ্বাসঘাতক। এরা দুজনেই আমাকে পাপের পথ দেখিয়ে দিল। অধোগতির যেটুকু বাকি ছিল তাও পূর্ণ হয়ে গেল—চুরি বাটপাড়ি বদমায়েসি সব শুরু করলাম। শেষে কেশবদাস মাগনিরামের সিন্দুক ভেঙে পঁচিশ হাজার টাকা লুঠ করলাম।

সেই টাকার বখরা নিয়ে গণ্ডগোল দেখা দিল। বিরিঞ্চি আর নিতাই যে শয়তান তা আমি জানতাম, কিন্তু কত বড় শয়তান তা আমার জানা ছিল না। বাইরে থেকে আরও একটা বদমায়েসকে সে জুটিয়ে আনল—সে অনাদি। এই অনাদি ও বিরিঞ্চিকে আপনি চেনেন। সেই দুজন—পুলিস-অফিসার সেজে আপনার স্টেশনে এসে জাকিয়ে বসেছিল, তারপর আপনাকে খুন করে মেল লুঠ করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সে পরের কথা—আগের ঘটনাই বলা যাক।

ওই তিনটে কাপুরুষ মিলে একটা পোড়ো বাড়িতে পেছন থেকে আমাকে ছোরা মারল। তারপর দরজায় শিকল টেনে দিয়ে পালিয়ে গেল। ওরা নিশ্চিত ভেবেছিল আমি মরে গেছি। আমার আঘাত সাঙ্ঘাতিক হয়েছিল—মরে যাওয়াই ছিল স্বাভাবিক। তবু আমি বাঁচলাম। ভাগ্যক্রমে একটু পরেই ও-বাড়িতে আমার একটি বন্ধু এসে পড়ে, বহু সেবাযত্ন করে সে আমাকে বাঁচিয়ে তোলে।

আমি বেঁচে উঠলাম। কিন্তু প্রতিশোধের কথা ভুলতে পারলাম না। খুঁজতে লাগলাম রাক্ষস তিনটেকে। নিতাই সরকার সবচাইতে ধূর্ত, বিরিঞ্চি আর অনাদিকেও সে কলা দেখিয়েছিল । তাই নিতাইয়ের শত্রু দাঁড়াল তিনজন—আমারও তিনজন । আজ আমারই জিত হয়েছে, তিন শৎব্বুই নিপাত হয়েছে ।

আমি নিতাইয়ের খোঁজে এলাম, সে-রাত্রির কথা নিশ্চয় আপনার মনে আছে। তারপর অনাদি আর বিরিঞ্চি এল তাদের কার্যোদ্ধার করতে। আমি দেখলাম, আশ্চর্য যোগাযোগে তিন শত্রুই আমার মুঠোর মধ্যে এসে পড়েছে। ওরা ওয়েটিং রুমে এসে আস্তানা গাড়লো, ওদের কথাবার্তা শোনবার জন্যে আমাকে কৌশল করে গিরিধারীর পোশাকটা জোগাড় করতে হল। শুনলাম সব, বুঝলাম ওদের মতলব। সেইসঙ্গে এও ঠিক করলাম, হয় ওদের একদিন, নয় আমারই একদিন।

কোথায় থাকতাম আমি? সুন্দরপুর বাজারে—মুসলমান ফকির সেজে রাত্রে বেরোতাম অভিযানে। যেদিন বিরিঞ্চি আর অনাদি ডাক লুঠ করতে এবং আপনাকে খুন করতে চেষ্টা করে, সেদিন বাইরে থেকে গুলি করে আমিই ওদের চক্রান্ত ব্যর্থ করেছিলাম। গিরিধারীকে বাঁচাতে পারিনি, সে-দুঃখ আমার রয়ে গেল। কিন্তু গণেশবাবু, হয়তো আপনার মনে আছে, প্রথমদিন ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছিলাম আপনাকে পুরস্কার দেব। সে-পুরস্কার দিয়েছি—আপনার প্রাণ বাঁচিয়েছি সেদিন। আমি খুনি বটে—আমাকে আপনি ঘৃণা করতে পারেন, কিন্তু আপনাকে যে দুটো পিশাচের হাত থেকে বাঁচাতে পেরেছি, এ-গৌরব চিরদিন আমার থাকবে। দুটো পিশাচ। হ্যাঁ, পিশাচ বইকি। কিন্তু পিশাচ হিসেবে বিরিঞ্চির তুলনা হয় না। পাছে বখরা নেয় এই জন্যে আহত অনাদিকে নীলকুঠির জঙ্গলে সে খুন করল। তার মতো বিশ্বাসঘাতক পৃথিবীতে খুব বেশি জন্মেছে বলে মনে হয় না। তারপর ওই নীলকুঠিতেই নিতাই সরকারকে ভয় দেখিয়ে সে চেক লিখিয়ে নিল, নিষ্ঠুরভাবে তাকেও হত্যা করল। ভালোই হল, ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারল। নইলে ও-দুটোকে খুন করার অপরাধও আমাকেই বইতে হত।

তারপর আমার কাজ আমি করলাম। আমি শেষ করলাম বিরিঞ্চিকে। এ-জন্য অনুতাপ করি না। ও-পাষণ্ডকে ইংরেজের আইন কোনওদিন ছুতে পারত না, কাজেই আমাকেই ওর বিচার করতে হল। অপরাধী হতে পারি, কিন্তু মনে আমার কোনও গ্লানি নেই। যে-পনেরো হাজার টাকার জন্যে এত রক্তপাত, সে-টাকা আমার হাতের মুঠোয়।

কিন্তু ও-পাপের ধনে আমার লোভ নেই। আমি বুঝেছি অন্যায়ের টাকা কত অন্যায়কে টেনে আনে, একটা পাপ কত পাপকে জমিয়ে তোলে। নিতাইয়ের বিশ্বাসঘাতকতায় আমার চোখ খুলে গেছে। ও-টাকা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলোতে আমি বিলিয়ে দেব—বিলিয়ে দেব মন্বন্তরে মুমূর্ষু বাংলাদেশের ক্ষুধিতদের ভেতরে।

'কালো হাতের' আজ থেকে মৃত্যু হল। শ্ৰীমন্ত রায় নতুন রূপে আজ বাঁচতে চেষ্টা করবে, বাঁচতে চেষ্টা করবে দেশের আর দশের সেবায়। জীবনে কোনওদিন আর আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে না ; যদি হয়ও,

আপনি আমাকে চিনতে পারবেন না।

আমি জানি এর পরে ওখানে পুলিশ তদন্তের ঢেউ এসে যাবে, বহু নিরীহ লোক অনর্থক হয়রান হবে। আপনি এই চিঠি তাদের দেখাবেন, বলবেন তিনটি মৃতদেহ পাওয়া যাবে নীলকুঠির জঙ্গলে, একটিকে পাওয়া যাবে পুরনো কুয়োটার মধ্যে। সেই-ই বিরিঞ্চি—পাপচক্রের নেতা। আর জানবেন, আজ থেকে মানিকপুর সুন্দরপুরের সমস্ত রহস্যের ওপর শেষ যবনিকা পড়ে গেল। আপনাকে আবার ধন্যবাদ—আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার। আশীর্বাদ করবেন, শ্রীমন্ত রায়ের হাত থেকে, মন থেকে যেন এই রক্তের দাগ মুছে যায়, যেন সহজ স্বাভাবিক মানুষ হয়ে মানুষের কল্যাণে সে বেঁচে থাকতে পারে। ইতি—

শ্রীমন্ত রায়।'

চিঠিখানা শেষ করে গণেশবাবু দুহাত তুলে নমস্কার করলেন।